বিদ্রোহী পূর্ব বাঙলা

অনিল রায়

॥ পরিবেশক ॥

আধুনিক ॥ ১১বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বিদ্রোহী পূর্ব বাঙলার জনগণকে

BIDROHI PURBA BANGLA

by

Anil Roy

Rupees Seven only

গুপ্তচর বিভাগের প্রধান, ব্রিগেডিয়ার ওসমান টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে একমনে ফাইলের পর ফাইল উল্টে চলেছিলেন।

ফাইলগুলো আজ সকালেই তিনি আনিয়েছেন।

তিন দিনের মধ্যে হেড কোয়ার্টারে বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠাতে হবে। পূর্ব বাংলার সরকারবিরোধী নেতাদের নাম, তাদের অতীত ইতিহাস, প্রত্যেকের বর্তমান অবস্থান এবং গতিবিধি সংক্ষিপ্তাকারে সব কিছুই পাঠাতে হবে রিপোর্টে।

ব্রিগেডিয়ার ওসমানের জন্ম হয়েছিল বিয়াল্লিশ বছর আগে পেশোয়ার শহরের এক ফৌজি বংশে। ওসমানের বাবা হবিবুল্লা খান ব্রিটিশ ফৌজে কাজ করেছেন পুরো তিরিশ বছর। হবিবুল্লা খানের বাবা হাফিজ খানও ছিলেন ব্রিটিশ ফৌজেই। ম্যাট্রিক পাশ করার পর ওসমান খানও পূর্বপুরুষের পদাংক অনুসরণ করে ঢুকে পড়েছিলেন ব্রিটিশ আর্মিতেই।

তার পরের বছরই দেশ ভাগ হয়ে পয়দা হয়েছিল পাকিস্তান।

দেশের সাথে সেনাবাহিনীকেও ভেঙে দু'ভাগ করা হয়েছিল।

আজকের ব্রিগেডিয়ার সেদিন ছিলেন সামান্য একজন লেফটেন্যান্ট। বিয়াল্লিশ বছরের ব্রিগেডিয়ারের আশার এখানেই শেষ নয়।

মেঘভাঙা রোদ ছড়িয়ে রয়েছে চারিদিকে।

গাঢ় নীলবর্ণ ধারণ করেছে আকাশ। অনেক দূর থেকে দেখা কুমায়ুন পাহাড়ও বোধহয় এত নীলবর্ণ ধারণ করে না।

ক'দিন ধরে আগুন ছড়াচ্ছে সূর্য।

প্রথম যে ফাইলখানা ব্রিগেডিয়ারের হাতে এলো, সেখানা পূর্ব পাকিস্তানের জনপ্রিয় নায়ক মৌলানা ভাসানীর।

এই সেদিনও পশ্চিম পাকিস্তানে তিনি দেখে এসেছেন ছিয়াশি বছরের বৃদ্ধ মৌলানাকে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতিনিধি হয়ে ভাসানী গিয়েছিলেন প্রেসিডেণ্ট আইয়ুব খানের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের অধিকার নিয়ে দর কষাকষি করতে।

রাজনৈতিক সওদায় ব্যর্থতার ঝুলি নিয়ে মৌলানা সাহেব যখন ফিরছিলেন, কিছু মস্তান তাঁকে সামান্য মেরামত করেছিল রাস্তায়। ক্ষেপে গিয়ে মৌলানা ভাসানী হুংকার ছেড়েছিলেন, দেশে রক্তনদী বইয়ে দেবেন তিনি।

পাতা উল্টে চললেন ব্রিগেডিয়ার।

পূর্ব পাকিস্তানে ফেরার পরেও দু'একটা গরম বুলি আওড়াতে ভুল হয়নি মৌলানা সাহেবের। কিন্তু যেদিন সামরিক শাসন কায়েম হল, তারপর থেকে আর দেখা নেই মৌলানা সাহেবের।

সব শেষে লেখা আছে, বর্তমানে তিনি স্বগ্রামে অবস্থান করছেন।

হিন্দুস্থানের সঙ্গে যখন যুদ্ধ বাধে, তখন প্রেসিডেণ্ট আইয়ুব খাঁ ঐ চীনপন্থী মৌলানা ভাসানীকে লালচীনে পাঠিয়েছিলেন চৌ এন লাই সাহেবের কাছে পাকিস্তানের হয়ে তদ্বিরের জন্যে। অপূর্ব দক্ষতায় সেদিন ভাসানী সাহেব হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে চীনের সহানুভূতি আদায় করেছিলেন।

ভাসানী সাহেবের ছবির দিকে তাকিয়ে বিস্মিত না হয়ে পারলেন না ব্রিগেডিয়ার।

ছিয়াশি বছর বয়স।

এই বয়সে যে তেজ, যে হিম্মৎ, যে আগুন ঐ দেহে রয়েছে, তা এখনো সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করতে সক্ষম।

মৌলানা ভাসানীর ফাইল একপাশে সরিয়ে রেখে দ্বিতীয় ফাইলে হাত দিলেন।

দ্বিতীয় ফাইল শেখ মুজিবর রহমানের।

শেখ মুজিবর রহমান একটি অসাধারণ জনপ্রিয় নাম।

এই সেদিনও পূর্ব বাংলার ছাত্র ও যুব-সমাজ 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেছেন শেখ সাহেবকে।

মুসলীম লীগের সমর্থক হিসাবে একদিন রাজনৈতিক জগতে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন শেখ মুজিবর রহমান। দৃঢ় সমর্থক ছিলেন পাকিস্তান সৃষ্টির। সেই শেখ মুজিবর রহমানকেই প্রেসিডেণ্ট আইয়ুব খান কারারুদ্ধ করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলা সৃষ্টির অপরাধে। প্রবল জনমত এবং পরিস্থিতির চাপে অবশ্য উক্ত অভিযোগ থেকে শেখ মুজিবর রহমান সাহেবকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

উনপঞ্চাশ বছরের এই জননেতার যুব-সমাজ ও ছাত্র-সমাজের ওপর অসাধারণ প্রভাব।

আরও একটা ফাইল তুলে নিলেন ব্রিগেডিয়ার ওসমান।

তোফাজ্জল হোসেন।

পূর্ব পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক। পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে অনন্যসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম। স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে কখনও পশ্চাৎপদ নয়। ছাত্র-সমাজ আজ যে অবস্থায় উপনীত, এর জন্যে তোফাজ্জল হোসেন সাহেবের সম্পাদকীয় অনেকাংশে দায়ী।

চতুর্থ ফাইল রোশনারা চৌধুরীর।

ফাইলের প্রথমেই রয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. পাঠরতা এই মেয়েটির এনলার্জ করা একটা ছবি।

পূর্ব পাকিস্তানের দ্বিধাবিভক্ত ছাত্র-সমাজের শক্তিশালী অংশ হচ্ছে এই রোশনারা গ্রুপ। বিগত নির্বাচনে এই রোশনারা চৌধুরীই সর্বসম্মতিক্রমে নেত্রী নির্বাচিত হয়েছে। রোশনারা চৌধুরী হিন্দু-মুসলিম মিত্রত্বের সুর তুলে এক নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে পূর্ব পাকিস্তানে।

রোশনারা চৌধুরীর ছবির দিকে তাকিয়ে সামান্য হেসে উঠলেন ব্রিগেডিয়ার।

খুবসুরৎ সন্দেহ নেই।

অনেকক্ষণ পরে একটা সিগারেট ধরালেন ব্রিগেডিয়ার ওসমান।

দুরন্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে দেশ।

কয়েক বছর আগেও মেয়েদের বোরখার বাইরে আসতে ছিল দ্বিধা, ছিল সংকোচ। অথচ সামান্য সময়ের ব্যবধানে মেয়েরা বোরখা তো সরিয়েছেই সমাজের সকল স্তরে যোগদান করে নেতৃত্ব পর্যন্ত দখল করেছে।

ছবিখানার দিকে এবার গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন।

এবারের ছাত্র-আন্দোলনের অনেকখানি অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে এই মেয়েটা।

রোশনারা চৌধুরীর প্রতিভা ছাত্রদের যতখানি উদ্বুদ্ধ করেছে, তার চেয়ে অনেক বেশী উৎসাহিত করেছে মেয়েটির রূপ।

ফটোর দিকে তাকিয়েই বলে দেওয়া যায় রোশনারা চৌধুরী অনন্য-সাধারণ রূপের অধিকারিণী।

পাশেই একটা খুব মূল্যবান ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস ছিল।

গ্লাসটা তুলে নিয়ে ছবির ওপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অনেক সময় ধরে দেখলেন।

বৃদ্ধ হয়েছেন মৌলানা ভাসানী।

জনপ্রিয়তাও তাঁর হ্রাসের দিকে। মাঝে মাঝে যতই হুংকার দিন, ভাসানী সাহেবের দিন ফুরিয়ে এসেছে।

তোফাজ্জল হোসেন, মুজিবর রহমান আর রোশনারা চৌধুরী।

হাতের সিগারেট ছাইদানীতে নামিয়ে রেখে কলিং-বেল টিপে আতাউর রহমান সাহেবকে পাঠিয়ে দেবার জন্যে হুকুম করলেন ব্রিগেডিযার ওসমান।

পাক-গুপ্তচর বিভাগে পূর্ব বাংলার যতজন বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ কর্মে নিযুক্ত আছেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে দক্ষ অফিসার হচ্ছেন এই আতাউর রহমান সাহেব।

ব্রিগেডিয়ার ওসমান এর আগেও অনেকবার তার প্রমাণ পেয়েছেন।

ঘড়ির দিকে তাকালেন দেরী দেখে।

আতাউর রহমান সাহেবের অফিসেই থাকবার কথা।

মিনিট দশেক অপেক্ষা করার পর হন্তদন্ত হয়ে আতাউর রহমান সাহেব উপস্থিত হলেন।

ফাইল থেকে খুলে রোশনারা চৌধুরীর ছবিখানা এগিয়ে দিলেন আতাউর রহমান সাহেবের সামনে।

ইসারা করলেন, সামনের চেয়ারে বসবার জন্যে।

চেনেন ?

ব্রিগেডিয়ার ওসমান আর একটা সিগারেট ধরালেন।

রোশনারা চৌধুরীকে চেনে না এমন মানুষ এই ঢাকা শহরে নেই বলেই আমার ধারণা, স্যার।

আতাউর রহমানের দৃষ্টি তখনো সামনের ছবিখানার ওপর নিবদ্ধ।

একটু ঝুঁকে পড়ে ছবিখানা তুলে নিলেন ব্রিগেডিয়ার ওসমান।

ফাইলের যথাস্থানে রাখলেন নিজের হাতেই। তারপর ফাইল-খানা বন্ধ করে গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন আতাউর রহমানের দিকে।

গত এক বছর ধরে জনপ্রিয়তার উচ্চ শিখরে এগিয়ে চলেছে ঐ রোশনারা চৌধুরী নামটা। আমাদের একটু বেশী সচেতন থাকতে হবে আতাউর রহমান সাহেব, কি বলেন ?

আজ্ঞে, মেয়েটা জনপ্রিয় সন্দেহ নেই। বিশেষ করে ছাত্র-সমাজের এক বৃহৎ অংশ মেয়েটার কথায় একরকম ওঠে বসে।

আপনি কতদিন থেকে চেনেন ঐ মেয়েটাকে ?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারলেন না আতাউর রহমান সাহেব।

নবাবপুর রোডের পুরনো বাসিন্দা ইউসুফ চৌধুরীর ছেলে আফাক চৌধুরী বিলেত থেকে ব্যারিষ্টারী পাশ করে হাইকোর্টে যাওয়া সুরু করেছিলেন আজ থেকে পনের বছর আগে। ক্রিমিনালে ভাল পসার

করে ফেলেন আফাক চৌধুরী পাঁচ বছরের মধ্যেই। আজ ঢাকা শহরে সবচেয়ে নাম করা ব্যারিষ্টার ঐ আফাক চৌধুরী। মামলায় আফাক চৌধুরী যে পক্ষ নেবে, জয় সেই পক্ষেরই হবে। একথা একরকম জোর গলায় বলা যেতে পারে।

সেই আফাক চৌধুরীর একমাত্র মেয়ে ঐ রোশনারা চৌধুরী।

একটা ছেলেও ছিল আফাক চৌধুরীর।

টিটেনাস হয়ে এক রাতের মধ্যে মারা গিয়েছিল ছেলেটা।

আতাউর রহমানের কাছে আফাক চৌধুরীর পরিবারের কোন ইতিহাসই অজানা নেই।

সেবার গয়াসপুরে জমি নিয়ে পাশের গ্রামের হাতেম মোল্লার সঙ্গে দাঙ্গা বাধলে আতাউর রহমান পর পর গুলি চালিয়ে তিন তিনটে লাস ফেলেছিল বিলের ধারে।

বছর দশেক আগের কথা।

পুলিশে দারোগায় বাড়ী বোঝাই হয়ে গেল।

বাবা তার একমাত্র ছেলেকে বাঁচাবার জন্যে ছুটলেন আফাক চৌধুরীর কাছে।

পুরো এক বছর ধরে মামলা চালিয়ে আফাক চৌধুরী নির্দোষী প্রমাণ করে খালাস করে এনেছিলেন আতাউর রহমানকে।

তার পরের বছরই ঢাকায় এসে আতাউর রহমান সৈন্য-বিভাগে যোগদান করেন। সেই আফাক চৌধুরীর মেয়ে রোশনারা চৌধুরীর কথা জানতে চাইছে ব্রিগেডিয়ার ওসমান সাহেব।

দশ বছর ধরে আমি ওদের চিনি, স্যার।

মাথা নাড়লেন আতাউর রহমান।

দশ বছর ধরে আফাক চৌধুরীর পরিবারকে চেনেন তিনি, দশ বছর ধরে ঐ রোশনারা চৌধুরীকেও ভাল করে চেনেন।

সাদা ধবধবে মোমের মত একটা পুতুল ঘুরঘুর করে বেড়াত নবাবপুর রোডে আফাক চৌধুরীর কাছারীবাড়ীর আশেপাশে।

বাবার সঙ্গে চৌধুরী সাহেবের বাড়ী গিয়ে ফাঁসীর কথা ভুলে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত মেমেদের মত ঐ মেয়েটার দিকে।

সেই মেয়েই আজ লোক ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছে।

সেই মেয়ের নামে স্পেশ্যাল ফাইল হয়েছে সামরিক দপ্তরের গুপ্তচর বিভাগে।

আতাউর রহমান যেন এখনো দেখতে পাচ্ছে, তার চোখের সামনে একটা ডল পুতুল ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছে।

হ্যাটস্ গুড, মিস্টার আতউর রহমান। প্রয়োজন হলে রোশনারা চৌধুরীর সব খবরই আপনার কাছে পাওয়া যাবে, কি বলেন?

আজ্ঞে, সাধ্যমত আমি যতটুকু জানি···আমার পক্ষে জেনে নেওয়া সম্ভব হয়েছে···আমার চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না, স্যার।

ফাইলের পাতা ওল্টালেন ব্রিগেডিয়ার ওসমান।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় রয়েছে রোশনারা চৌধুরীর দেহের বিবৃতি, তার শরীরের মাপজোফ এবং বিশেষ বিশেষ চিহ্নের বিবরণ।

চৌত্রিশ বাইশ চৌত্রিশ।

আশ্চর্য!

সিগারেটে টান দিতে গিয়ে দেখলেন, অজ্ঞাতসারে কখন সবটা পুড়ে গেছে। আর একটা সিগারেট ধরালেন ব্রিগেডিয়ার। তারপর সিগারেটের টিনটা আতাউর রহমানের দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, চলবে?

আজ্ঞে, না না।

সংকুচিত হয়ে পড়লেন আতাউর রহমান।

সংকোচের কোন কারণ নেই, মিঃ রহমান। আপনি অনায়াসে একটা ধরাতে পারেন।

এবার বেশ জোরের সঙ্গেই আপত্তি জানালেন আতাউর রহমান সাহেব।

ব্রিগেডিয়ারের সামনে একবার সিগারেট টেনে নিজের সার্ভিস—

বুকে চিরকালের জন্যে কালির আঁচড় টানতে নারাজ তিনি।

কে জানে কোন্ মুডে আছে সাহেব!

রোশনারা চৌধুরীর মত কোন সুন্দরী মেয়ের ছবির সামনে ডিসিপ্লিন হঠাৎই আল্গা হয়ে যায়।

রোশনারা-প্রসঙ্গ শেষ হলে, ঐ ব্রিগেডিয়ার সাহেবই হয়তো সিগারেট খাওয়ার কথা স্মরণ করে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠবেন! পাঞ্জাবীদের তিনি মর্মে মর্মে জেনে নিয়েছেন।

ফাইলের ওপর বেশ খানিকটা ঝুঁকে পড়লেন ব্রিগেডিয়ার ওসমান।

রাজনীতি নিয়ে মাতামাতি না করে আপনাদের ঐ রোশনারা চৌধুরী যদি আমেরিকার মীয়ামি বীচে বিশ্ব-সুন্দরী প্রতিযোগিতায় নাম লেখাত, মেয়েটা তাহলে বিচারকদের মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারতো অনায়াসেই। দেহের ঐ নিখুঁত প্রোপোরসন, তারপর উত্তেজক মুখ নিয়ে নির্ঘাৎ বিজয়িনী হয়ে মিস ইউনিভার্স আখ্যায় ভূষিতা হয়ে নিজের ও তামাম পাকিস্তানের নাম রোশন করতে পারতো।

সিগারেটে একটা টান দিলেন ব্রিগেডিয়ার ওসমান।

রাজনীতি রোশনারা চৌধুরীকে পূর্ব পাকিস্তানে খ্যাতি এনে দিয়েছে। খ্যাতির পিছনেও আবার এই বিড়ম্বনা। বিশ্ব-সুন্দরী প্রতিযোগিতা তাকে বিশ্বখ্যাতি এনে দিতে পারত।

আতাউর রহমান ব্রিগেডিয়ারের কথা শুনে চললেন।

পূর্ব পাকিস্তানে এমন সব বসরার গোলাপ ফুটে আছে, তা কেউ জানে না। পূর্ব পশ্চিমের এই যে এক অলিখিত বিরোধ অনায়াসে তার মীমাংসা হয়ে যেত।

অসতর্ক মুহূর্তে কিছুটা ধোঁয়া হয়ত বিপথে চলে গিয়ে থাকবে। খুকখুক করে কেশে উঠলেন।

উর্ধ্বতন অফিসারের সামনে কোন মেয়ের বিশেষ এক দিক নিয়ে আলোচনা করতে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন আতাউর রহমান।

বড় বড় অফিসারদের খুব ভাল করে তিনি চিনে রেখেছেন।

আলোচনার মধ্যে কোন অসতর্ক মুহূর্তে যদি বেফাঁস কিছু বলে ফেলা যায় ওঁরা সে-কথা ঠিকই মনে করে রাখেন। আশ্চর্যভাবে ভুলে যান তাদের রসালো আলাপ।

যতটা সম্ভব চুপ করে ছিলেন আতাউর রহমান।

চুপ করে থাকাই তাঁর কাছে বুদ্ধিমানের কাজ।

মাত্র গতকাল অফিসের ভার নিয়েছেন ব্রিগেডিয়ার ওসমান।

অবশ্য সামরিক বিভাগের দক্ষ এই অফিসারটির কথা এর আগেও বহুবার তিনি বহুভাবে শুনে এসেছেন।

আবার কিছুক্ষণের জন্য চুপচাপ।

ফাইলের মধ্যে ফিরে গেলেন ব্রিগেডিয়ার সাহেব।

ফাইলের ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে এক জায়গায় থেমে গেলেন ব্রিগেডিয়ার ওসমান। দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করলেন, ইস্ট এণ্ড মেডিক্যাল স্টোর্স।

চমকে উঠলেন আতাউর রহমান।

ব্রিগেডিয়ার পড়ে চললেন, ইস্ট এণ্ড মেডিক্যাল স্টোর্স-এর ঘটনার নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল ঐ রোশনারা চৌধুরী। ঐ ঘটনার সমস্ত দায়িত্বও ঐ রোশনারা চৌধুরীর।

আতাউর রহমান সাহেব!

ব্রিগেডিয়ারের কণ্ঠস্বরে আবার চমকালেন আতাউর রহমান।

তাঁর চোখের সামনে আশ্চর্যরকমভাবে বদলে যাচ্ছে ঐ পাঞ্জাবী ব্রিগেডিয়ার ওসমান।

একটা শান্ত কুকুর যেন দেখতে দেখতে একটু একটু করে পরিণত হচ্ছে দুর্দান্ত এক রয়েল বেঙ্গল টাইগারে।

কারণ ব্রিগেডিয়ারের এই অস্বাভাবিক ক্রোধের কারণ বুঝতে অসুবিধা হয় না আতাউর রহমানের।

ঢাকার সব থেকে বিখ্যাত মেডিক্যাল স্টোর্সের মালিক ইয়াকুব খাঁ

পূর্ব বাংলায় ব্যবসা করতে এসেছিলেন পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে।

পাঞ্জাবের পেশোয়ার শহরে বাড়ী ইয়াকুব খাঁর।

ব্রিগেডিয়ারের বাড়ীও ঐ একই পেশোয়ার শহরে।

অথচ এই ঢাকা শহরের দু'জন মানুষকে করাচীর এক হোটেলে ঠিক কুত্তার মত কামড়াকামড়ি করতে দেখেছেন তিনি। ওরা দু'জনেই ছিল বাঙলা ভাষাভাষী, বাঙালী।

ইস্ট এণ্ড মেডিক্যাল স্টোর্সের ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ আমি চাই মিঃ রহমান।

প্যাণ্টের পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলেন ব্রিগেডিয়ার।

আতাউর রহমান তাকিয়ে দেখতে পেলেন তাঁর সামনে যেন অন্য একজন মানুষ এসে এই মাত্র বসল। একটু আগে যে ব্রিগেডিয়ার তাঁর সঙ্গে মীয়ামি বীচের কথা বলছিলেন এ যেন তিনি নন, সম্পূর্ণ আলাদা একজন মানুষ।

একটা ঢোক গিললেন আতাউর রহমান।

আমি সব ইতিহাস জানি, স্যার।

গুড ! আপনি সমস্ত খবর দিতে পারবেন ?

টেবিলের ওপর দৃষ্টি রেখে আতাউর রহমান বললেন, আজ্ঞে, হ্যাঁ স্যার।

তাহলে স্থুরু করুন, মিঃ আতাউর রহমান।

টেবিলের ওপর দু'হাত রেখে ঝুঁকে পড়লেন ব্রিগেডিয়ার ওসমান।

আতাউর রহমান সাহেবের মনে হল, ঠিক যেন একটা বাঘ থাবা বাগিয়ে নিয়ে বসল।

যে কোন মুহূর্তে প্রয়োজন হবে ঝাঁপ দেবে শিকারের ওপর।

গো অন।

জিভ দিয়ে ঠোঁট মুছলেন ব্রিগেডিয়ার।

আতাউর রহমানের সামনের বাঘটা যেন তার জিভ বের করে

মুখ মুছে নিল।

ব্রিগেডিয়ারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর হয়ে আতাউর রহমানের মুখের ওপর এসে পড়েছে। সেদিকে তাকিয়ে বিদ্যুৎগতি এক চিন্তা আতাউর রহমানের মনের ভেতর দিয়ে বয়ে গেল। ব্রিগেডিয়ারের চোখে কোন সন্দেহ নেই তো ?

অনেক কথা উপযাচক হয়েই তিনি বলে ফেলছেন। এতে ঐ পাঞ্জাবী ব্রিগেডিয়ারের মনে কোন সন্দেহের সৃষ্টি যদি করে থাকে ?

মাত্র পাঁচদিন আগের কথা।

সুরু করলেন আতাউর রহমান সাহেব—

রাত তখন দুটো বেজে গেছে।

ঢাকা শহরের রাজপথ ফাঁকা।

পুলিশ শহরে আছে বলে মনেই হয় না।

একটু অপেক্ষা করুন, রহমান সাহেব।

একটা খাতা টেনে নিয়ে কলম খুলে নিলেন ব্রিগেডিয়ার ওসমান।

আপনার বলবার ভঙ্গীটি বড় চমৎকার।

হাসলেন ব্রিগেডিয়ার ওসমান।

বাঘের মুখে হাসি দেখতে পেলেন আতাউর রহমান।

হাসি মিশিয়েই ব্রিগেডিয়ার ওসমান বললেন, আজকাল সব বিখ্যাত লোকেরাই রিটায়ার্ড লাইফের আত্মজীবনী লিখে লেখক নাম কিনে ফেলেন। তাতে পয়সাও আসে প্রচুর। এই সখ হয়ত আমার জীবনেও আসতে পারে, সেদিন আপনার এই বিচিত্র ঢঙে বলা রোশনারা চৌধুরীর কাহিনী হয়ত কাজে লাগতে পারে।

একটু থেমে ব্রিগেডিয়ার ওসমান আবার বললেন, আমাদের সৈনিকের জীবন আজ আছে কাল নেই। যুদ্ধ বাধলেই আমাদের জীবনযুদ্ধও সুরু হয়। তাই না, মিঃ রহমান ?

ব্রিগেডিয়ারের মুখের হাসি তখনও জিয়ানো রয়েছে।

আতাউর রহমান সাহেবকেও হাসতে হল।

হেসেই ব্রিগেডিয়ার ওসমান আবার বললেন, সৈনিকের জীবন পঞ্চাশ হলেই শেষ। অথচ রাজনীতিবিদদের জীবনের সবে সুরু হয় পঞ্চাশোত্তরে। রিটায়ার্ড লাইফের পর বেঁচে থাকবার জন্যেও একটা কিছু করতে হয়। জীবনের অভিজ্ঞতা যা চাকরীর মধ্যে দিয়ে সঞ্চয় করে চলেছি, একদিন কাগজে লিপিবদ্ধ করে বাজারে দাঁড়াব। আপনি দেখবেন মিঃ রহমান, আমার সঞ্চয়ের কোঠায় যে সকল ঘটনা আছে, তা দিয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রোমাঞ্চকর গ্রন্থ রচিত হবে।

টেবিলের ওপর ছোট্ট একটা মুষ্ঠাঘাৎ করে ব্রিগেডিয়ার বললেন, আই উইল রাইট। ইনডিয়ান জেনারেল কল যদি আনটোল্ড স্টোরী লিখে রাতারাতি সাহিত্য-জগতের খ্যাতি কুড়োতে পারে, আমি ব্রিগেডিয়ার ওসমানও নিশ্চয়ই বিখ্যাত হব।

আমাদের কাজের ক্ষতি হচ্ছে, মিঃ রহমান।

মুখের হাসিটুকু ঠিক যেন ব্লটিং পেপার দিয়ে কালি শুকানোর মত রুমাল বের করে মুছে ফেললেন মুখের ওপর থেকে।

এবার সুরু করুন, মিঃ আতাউর রহমান।

একটু একটু করে আবার হিংস্র হয়ে উঠছেন ব্রিগেডিয়ার ওসমান।

আতাউর রহমান সুরু করলেন—

পুলিশ রাস্তায় বেরুতে ভয় পায়, মানুষও ভয়ে রাস্তায় বেরোয় না।

জনতার রাজত্ব সুরু হয়েছে ক'দিন ধরেই।

একটু থেমে ব্রিগেডিয়ারের মুখের দিকে তাকিয়ে আতাউর রহমান বললেন, মিলিটারীরা নিরাপদ স্থানে পালিয়ে গেছে।

মিলিটারী পালিয়ে গেছে?

নীরবে মাথা নাড়লেন আতাউর রহমান।

আপনি কি বলছেন, রহমান সাহেব?

আজ্ঞে, সংখ্যাল্পতার জন্যে সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করতে ভরসা পায়নি সামরিক কর্তৃপক্ষ।

শাসন বিভাগের আহ্বান বার বার প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

হাতের ইসারায় আতাউর রহমান সাহেবকে থামতে বলে ব্রিগেডিয়ার খসখস করে কাগজে লিখে চললেন।

আতাউর রহমান বসে রইলেন সামনে।

লেখা শেষ হলে পর আবার মুখ তুললেন ব্রিগেডিয়ার।

সুরু করলেন আতাউর রহমান—

কৃষ্ণপক্ষের রাত।

রাতের অন্ধকারে নির্জনপথ ধরে প্রায় হাজারখানেক মানুষ উপস্থিত হল ঢাকার সব থেকে বড় মেডিক্যাল স্টোর্সের সামনে—ইস্ট এণ্ড মেডিক্যাল স্টোর্স।

সদর রাস্তার ওপরে তিন তলা বাড়ীর নিচের তলায় দোকান আব ওপরে থাকেন ইয়াকুব খাঁ ও তাঁর পরিবার।

পূর্ব বাংলার মানুষ তখন ক্ষেপে উঠেছে। এক একজন করে বেছে নিচ্ছে আর তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে দুনিয়া থেকে। সেখানে হিন্দু-মুসলমান নেই, ধনী-দরিদ্র নেই, বাঙালী-পাঞ্জাবী নেই।

যারা আক্রমণ হানছে তাদের অধিকাংশই ছাত্র। কিছু সমাজ-বিরোধীও যোগ দিয়েছে। তারা এসেছে লুঠের আশায়।

আর ছাত্ররা ?

হঠাৎ মাঝপথে প্রশ্ন করলেন ব্রিগেডিযার ওসমান।

ছাত্ররা কিসের জন্যে জড় হয় ?

ওরা বলে, বেইমানী, ঘুষখোর, ধোকাবাজী তামাম পূর্ব পাকিস্তানের বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

ইস্ট এণ্ড মেডিক্যাল স্টোর্সের মালিক ইয়াকুব খাঁর অপরাধ ?

ইয়াকুব খাঁর অপরাধ দশ বছরে তাঁর ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স লক্ষ থেকে কোটির অঙ্কে পৌচেছে।

তারপর ?

আগে থেকেই একটা সিডন বডি কালো গাড়ি ইয়াকুব খাঁর

বাড়ীর কাছে অপেক্ষা করছিল।

সেই গাড়িতে ছিল রোশনারা চৌধুরী।

রোশনারা চৌধুরী একা ?

আজ্ঞে, না।

ব্রিগেডিয়ার ওসমানের মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে টেবিলের ওপরে রাখা একটা সুদৃশ্য কাচের পেপার-ওয়েটের দিকে তাকালেন।

আর কে ছিল গাড়িতে ?

আতাউর রহমান সাহেব নিরুত্তর।

তার দৃষ্টি তখনও সেই পেপার-ওয়েটের ওপর নিবদ্ধ।

আতাউর রহমান সাহেব ?

স্যার ?

ব্রিগেডিয়ার ওসমানের কণ্ঠস্বরে চিন্তিত এবং ভীত হয়ে পড়লেন আতাউর রহমান। তবু তাঁকে নিরুত্তর থাকতে হল।

আতাউর রহমান সাহেব, আমি জানতে চাইছি যে, রাত্রে রোশনারা চৌধুরীর সঙ্গে আর কে কে ছিল ?

কি উত্তর দেবেন ভেবে পান না আতাউর রহমান।

আতাউর রহমানের দৃষ্টি অনুসরণ করে পেপার-ওয়েটের দিকে তাকিয়ে ব্রিগেডিয়ার ওসমান বলে উঠলেন, আতাউর রহমান সাহেব, নিজে·কি ঐ পেপার-ওয়েটের মত জড়বস্তুতে পরিণত হয়েছেন ?

আমাদের ডিপার্টমেণ্ট এর বেশী আর কোন সংবাদ সংগ্রহ করতে পারেনি। সেদিন রাত্রে গাড়ির মধ্যে শুধু রোশনারা চৌধুরীর উপস্থিতি আমরা জেনেছি।

ফুলস্।

গর্জন করে উঠলেন ব্রিগেডিয়ার ওসমান।

আমাদের দপ্তরের ক্ষমতা কি এতে সীমাবদ্ধ ?

সে-রাত্রে সমস্ত সহর জনতার হাতে ছিল, স্যার! শাসনব্যবস্থা বলতে কিছুই ছিল না।

সেনাবাহিনীর কোন গাড়ির পক্ষে সে-রাত্রে রাস্তায় বেরোবার অর্থ ছিল চরম ও নিশ্চিত বিপদের মধ্যে ঝাঁপ দেওয়া।

কাগজে খসখস করে কি যেন লিখে চললেন ব্রিগেডিয়ার ওসমান।

মনের মধ্যে একরাশ অস্বস্তি নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

মিনিট দুয়েক অতিক্রান্ত হবার পর ব্রিগেডিয়ার বললেন, প্রসিড মিঃ আতাউর রহমান। বলুন, তারপর কি ঘটেছিল সেরাত্রে।

হাজার মানুষের এক উন্মত্ত জনতা প্রচণ্ড আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ইস্ট এণ্ড মেডিক্যাল স্টোর্সের ওপর।

দেখতে দেখতে আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না ঢাকার সব চাইতে বড় ডাক্তারখানার।

জনতা ফিরে যেতে উদ্যত হলে গাড়ি থেকে নেমে এসেছিল রোশনারা চৌধুরী নিজে।

সর্বাঙ্গে তার কালো পোশাক।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে চীৎকার করে উঠেছিল রোশনারা চৌধুরী, এত অল্পতেই আপনারা শান্ত হতে পারলেন? এত সহজেই আপনারা ক্ষমা করতে পারলেন মানুষরূপী শয়তান ইয়াকুব খাঁকে? কিন্তু পেনিসিলিনের বদলে শুধু সল্ট ভরা শিশির ওষুধে যে মায়ের কোলে শিশু মরেছে, কই একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর শোকে সে মায়ের চোখের জল তো এত সহজে শুকোয় না? পাঁচসিকে, দেড় টাকা, দু'টাকার জন্যে একজন নয়, দু'জন নয়, শ'য়ে শ'য়ে মানুষ খুন করেছে ঐ ইয়াকুব খাঁ, আপনার ঘরে, আমার ঘরে, আপনার পাশের বাড়ীতে। তার শাস্তি?

পাঞ্জাব থেকে এখানে এসে ব্যবসা করে নয়, বাংলার মানুষ খুন করে ঐ তিনতলা প্রাসাদ উঠেছে। যদি সামান্য মনুষ্যত্ব, সামান্য বিবেক থাকে তাহলে ধূলোয় মিশিয়ে দিন ঐ প্রাসাদ। বাংলার মানুষ মরেছে আর ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স বেড়েছে ঐ পাঞ্জাবীর। এত সহজে

আমরা ভুলব না। আমাদের চোখের সামনে আমাদের বাপ মা ভাই বোন দাপিয়ে দাপিয়ে মরেছে একবিন্দু ওষুধের অভাবে; আর ঐ শয়তান জাল ওষুধ বিক্রি করে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখে সংসার করছে!

ঐখানেই থামেনি রোশনারা।

গলা ধরে এসেছিল আতাউর রহমানের।

কেশে গলা পরিস্কার করে ব্রিগেডিয়ার ওসমানের মুখের দিকে তাকালেন আতাউর রহমান।

ব্রিগেডিয়ার ওসমান তখন পারেন তো ছিঁড়ে খেয়ে ফেলেন রোশনারা চৌধুরীকে—

বাংলার মেয়ের এত হিম্মৎ? আচ্ছা!

টেবিলের ওপর এক টুকরো বাজে কাগজ ছিল, তুলে নিয়ে হাতের মুঠোয় পিষতে লাগলেন ব্রিগেডিয়ার ওসমান।

তারপর?

চীৎকার করে উঠেছিল রোশনারা, বদলা চাই! খুনের বদলে খুন, মৃত্যুর বদলে মৃত্যু।

হাজার মানুষ আবার ফিরে দাঁড়িয়েছে রোশনারার কথা শুনে।

হাজার জোড়া চোখ চেয়ে আছে পরের কথা শুনবার জন্যে রোশনারার দিকে।

ইয়াকুব খাঁকে মরতে হবে। অনেক খুন নিয়েছে ইয়াকুব খাঁ বাংলার মানুষের, কিছু খুন ঝরিয়ে যাক ইয়াকুব খাঁ এই বাংলার মাটিতে।

হাজার লোক আবার ফিরল ইয়াকুব খাঁর উদ্দেশ্যে।

শুধু ওষুধের দোকান লুঠ করে যারা সন্তুষ্ট হয়ে ফিরছিল, ইয়াকুব খাঁর খুন লুঠ করার জন্যে তারাই আবার হুঙ্কার ছাড়ল।

দেখতে দেখতে হাজার মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ল ইয়াকুব খাঁর বাড়ীর ওপর।

আর রোশনারা চৌধুরী?

আপন প্রয়োজন মিটিয়ে রোশনারা চৌধুরী তার গাড়ি নিয়ে স্থান ত্যাগ করে চলে গেছে ততক্ষণে।

মিঃ আতাউর রহমান ?

ছুটো হাত দিয়ে টেবিলটাকে শক্ত করে চেপে ধরলেন ব্রিগেডিয়ার ওসমান।

মিনিট কুড়ির মধ্যে সব শেষ হয়ে যায়, স্যার।

ইয়াকুব খাঁ ?

হাজার টুকরো হয়ে ইয়াকুব খাঁর মাংস ততক্ষণে হাজার হাতে পৌঁছে গেছে।

বাড়ীর অপর সকলে ?

ইয়াকুব খাঁর একটা মেয়ে ছিল, স্যার। মেয়েটা খুবই সুন্দরী। সেরা এই মেয়েটা উধাও হয়ে যায়। আজ পর্যন্ত কোন সংবাদ নেই মেয়েটার।

হুঁ

অনেকক্ষণ পরে আবার একটা সিগারেট ধরালেন ব্রিগেডিয়ার ওসমান। ডিপার্টমেন্ট যাতে মেয়েটাকে খুঁজে বের করতে পারে সেই চেষ্টা করতে বলব একবার। ডিপার্টমেন্টকে বলব যদি প্রয়োজন হয় পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যেকটি ঘরে তালাশ করতে। তবু খুঁজে বার করতে হবে ইয়াকুব খাঁর মেয়েকে।

রোশনারার ছবিটা আবার ফাইল থেকে বের করলেন ব্রিগেডিয়ার ওসমান। রোশনারার ফটোর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, ডিপার্টমেন্টকে আরো বলব যেন এই মেয়েটিকেও খুঁজে বের করে। এই রোশনারা চৌধুরী। শুনতাম বাংলার মেয়ে বহুৎ মিষ্টি। একবার খুঁজে বের করে দেখতে হবে কত মিষ্টি ঐ বাংলার মেয়ে রোশনারা চৌধুরী। দেখতে হবে কত শক্তি ধরে ঐ নাগিনী। ফটো সমেত রোশনারা চৌধুরীর ফাইল তুলে রাখলেন ব্রিগেডিয়ার ওসমান। তারপর আতাউর রহমানকে বললেন :

হিসেব মত বাংলা দেশে তিনশ' মানুষ খুন হয়েছে। ঐ একই পদ্ধতিতে উন্মত্ত জনতা চড়াও হয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছে তিনশ' মানুষ। দ্বিতীয় কোথাও কি দেখা গিয়েছে রোশনারা চৌধুরীকে ?

আজ্ঞে, না স্যার। তেমন রিপোর্ট আমাদের অফিসে নেই।

তবে ঐ ইয়াকুব খাঁর ওপরেই যত আক্রোশ ছিল কেন রোশনারা চৌধুরীর ?

কপালের রেখাগুলো সংকুচিত হয় ব্রিগেডিয়ার ওসমানের।

আমি কিছুটা জানি, স্যার !

কি জানেন আপনি ?

রোশনারা চৌধুরীর ক্রোধের কারণ।

কি করেছিল ইয়াকুব খাঁ ঐ রোশনারা চৌধুরীর ! ইজ্জৎ লুঠ করেছিল ?

আজ্ঞে, না স্যার।

তাইলে ?

একটা ফুটফুটে ভাই রোশনারা চৌধুরীর। রোশনারা চৌধুরীর মতই সুন্দর।

বয়সে বছর ছয়েকের ছোট ছিল ভাই।

বছর দুয়েক আগেকার কথা, রমনার মাঠে ফুটবল খেলতে গিয়ে আহত হয়ে একদিন রাত্রে বাড়ী ফেরে রোশনারা চৌধুরীর ভাই সেলিম চৌধুরী। ভাল খেলতো সেলিম। ঢাকায় ডিপ ডিফেন্সে ভাল নাম ছিল ছেলেটার।

খেলায় একদিন আপনারও কম নাম ছিল না, আতাউর রহমান।

ব্রিগেডিয়ারের কথায় বিস্মিত হয়ে আতাউর রহমান মুখের দিকে চাইলেন।

ডিপ ডিফেন্স !

মাথা নাড়লেন ব্রিগেডিয়ার ওসমান।

ঐ একটি মাত্র কথাই প্রমাণ করে দিয়েছে খেলাধূলার জগতে একদিন আপনিও নামী ছিলেন।

লজ্জিত হয়ে দৃষ্টি নামিয়ে নিলেন আতাউর রহমান।

আমিও একদিন খেলতাম, মিঃ রহমান। ভালই খেলতাম। তাই আমি জানি ঐ ডিপ ডিফেন্স কথাটা খেলোয়াড় ছাড়া অপর কেউ কথা প্রসঙ্গে ব্যবহার করবে না। খেলা সম্বন্ধে সে যত বড় সমালোচক, যত বড় অথরিটিই হোক না কেন।

আপনি ঠিকই ধরেছেন, স্যার। অধম একদিন ভালই খেলতো ঢাকার মাঠে। কোন বিদেশী টিম এলে এই অধমের ডাক পড়ত খেলার জন্যে।

বুটের স্পাইকে ডান পায়ের অনেকটা জায়গা জুড়ে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল।

ছেলেটা বাড়ী ফিরে যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে।

সামান্য হাসবার চেষ্টা করলেন আতাউর রহমান।

বড়লোক ব্যারিষ্টারের একমাত্র ছেলে। সুতরাং রাত্রের দিকে ডাক্তার এলো। যন্ত্রণা তখন বেশ বেড়ে গেছে।

ডাক্তার এসে দেখেই এটি এস-এর ব্যবস্থা করলেন। ডাক্তারখানা থেকে এম্পুল আনিয়ে নিজের হাতে ইন্‌জেকসন দিয়ে গেলেন। যাবার সময় আশ্বাস দিয়ে বলে গেলেন, এখন আর ভয়ের কারণ নেই। অবশ্য ওষুধ না পড়লে চিন্তার কারণ খানিকটা ছিলই।

ডাক্তারের কথায় আশ্বস্ত হয়ে সেরাত্রে শুতে গিয়েছিলেন সেলিমের বাবা আফাক চৌধুরী আর দিদি ঐ রোশনারা চৌধুরী।

রাত দুটোর সময় আসল রোগ প্রকট হয়ে পড়ল।

কি রোগ? ধনুষ্টংকার?

ব্রিগেডিয়ার ওসমান চেয়ারের ওপরে নড়েচড়ে বসলেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, টিটেনাস।

আতাউর রহমান বললেন, সেলিমের শরীর তখন যন্ত্রণায় ধনুকের

মত বেঁকতে সুরু করেছে।

ডাক্তার ডাকার জন্যে নিজে ছুটে গেলেন ডাক সাইটে ব্যারিষ্টার আফাক চৌধুরী।

ডাক্তার এসে মুখ গম্ভীর করলেন।

নিশ্চয়ই কোথাও কিছু অঘটন ঘটেছে, মিঃ চৌধুরী। বার বার বলতে লাগলেন ডাক্তার।

ডাক্তারবাবু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। একটা কিছু করুন।

আর্তনাদ করতে থাকে রোশনারা।

আর তার চোখের সামনে বিছানার ওপর ধনুকের মত বেঁকে যেতে থাকে যন্ত্রণায় তার একমাত্র ভাই সেলিম।

যন্ত্রণায় মুখ দিয়ে গাঁজলা উঠতে থাকে সেলিমের, একটু একটু করে কথা বন্ধ হয়ে যায়, জ্ঞান হারিয়ে ফেলে সেলিম।

শিয়রের কাছে খাটের হাতল চেপে ধরে ঠোঁট কেটে রক্ত বের করে ফেলে রোশনারা।

ওকে বাঁচান ডাক্তারবাবু, ও যে মরে গেল!

এক সময় রোশনারা ছিটকে এসে দুটো পা জড়িয়ে ধরল ডাক্তার রমজান আলির।

জানালা দিয়ে রাত্রির আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে আফাক চৌধুরী। সেলিমের দিকে তাকাবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন তিনি।

ডাক্তার রমজান আলি মেঝের ওপর কি যেন খুঁজতে থাকেন।

সেলিম তখন প্রায় শেষ হয়ে গেছে।

সোনার অঙ্গ নীল হয়ে গেছে।

আপনারা কেউ তাহলে বাঁচাবেন না আমার ভাইকে। কিন্তু আমি ওকে ধরে রাখবো। ওকে আমাদের ছেড়ে কিছুতেই চলে যেতে দেব না।

বেঁকে যাওয়া সেলিমের ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ল রোশনারা।

চীৎকার করে কেঁদে উঠলো, আমি তোকে ছাড়বো না ভাই, আল্লা

তোকে ছিনিয়ে কিছুতেই নিতে পারবে না আমার কাছ থেকে।

আল্লা রাহেম।

চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল রোশনারা তার ভাইয়ের দেহের ওপর।

কিন্তু আল্লা রাহেম করেনি।

তার আগেই কেড়ে নিয়ে গেছে সেলিমকে।

ডাক্তার রমজান আলি খালি এটি এস-এর শিশিটা আলোর সামনে তুলে ধরে কি যেন দেখছে।

আর, আর পর্দার আড়ালে একটা মানুষ অব্যক্ত যন্ত্রণায় নিজের হৃদয়টাকে টুকরো টুকরো করে ফেলছে, সে সেলিমের মা, ডাক্তারের উপস্থিতিতে পরিবারের আব্রু বাঁচাবার জন্যে।যার ছেলের মৃত্যুকালেও ঘরে ঢোকা নিষেধ।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে রোশনারা আবার চীৎকার করে উঠেছিল, সেলিম!

সেলিম সেলিম সেলিম!

চৌধুরী সাহেব বলেন, আজো নাকি তার মেয়ে ঘুমের ঘোরে সেলিম সেলিম বলে চীৎকার করে ওঠে।

কালের আবহাওয়া যেন ভারী হয়ে উঠেছে।

ব্রিগেডিয়ার ওসমান বললেন, সে তো আসবেই। মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখার সাধ্য তো মানুষের নেই।

কিন্তু স্যার, রোশনারা চৌধুরীর অভিযোগ, সেলিমের মৃত্যু হয়নি, তাকে বাঁচতে দেওয়া হয়নি। সেলিমের মৃত্যু এসেছে বেইমানী ও লোভের পথ বেয়ে। খুন করা হয়েছে সেলিমকে।

হয়ত সামান্য চমকেই উঠেছিলেন ব্রিগেডিয়ার ওসমান।

সেলিমকে খুন করা হয়েছিল!

ডাক্তার এটি এস-এর এম্পুল সন্দেহ বশতঃ পরীক্ষার জন্যে পাঠান, পরীক্ষায় প্রমাণ হয়েছে নকল ওষুধ ভরা ছিল এম্পুলে।

আই সী !

রুমাল বের করে মুখ মুছলেন ব্রিগেডিয়ার ওসমান।

পর পর সব ক'টা ওষুধ টেস্ট করে জাল প্রমাণিত হয়।

কোন্ দোকান থেকে আনা হয়েছিল ওষুধ ?

ইস্ট এণ্ড মেডিক্যাল স্টোর্স, ইয়াকুব খাঁর দোকান থেকে।

আর সেই জন্যেই মওকা বুঝে প্রতিশোধ নিয়েছে রোশনারা।

আচ্ছা আপনি এবার যেতে পারেন।

আতাউর রহমান চলে যাচ্ছিলেন।

দরজার সামনে তাকে হঠাৎ থামতে বললেন ব্রিগেডিয়ার ওসমান।

ঘুরে দাঁড়ালেন আতাউর রহমান।

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন ব্রিগেডিয়ার ওসমান।

আতাউর রহমানের খুব কাছে সরে এলেন।

রোশনারা চৌধুরী এবং তার পরিবারের অনেক খবরই আপনি রাখেন দেখলাম।

কোন উত্তর দিলেন না আতাউর রহমান।

রোশনারা চৌধুরীকে আজ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে আমার চাই, মিঃ আতাউর রহমান। আই মীন আমার দপ্তরে তাকে চাই। আপনি যেখান থেকে পারেন তাকে ধরে নিয়ে আসুন, এ দায়িত্ব আপনার ওপর রইল রহমান সাহেব।

আজ্ঞে—

আমাদের অফিসে আপনার মত আর কেউ এদের খবর এমন করে জানে না মিঃ রহমান। সুতরাং এ কাজের ভার আপনাকে নিতেই হবে।

পাকিস্তান পয়দা হয়েছিল সাতচল্লিশে, আর সামাদ মিঞার জিন্নৎ মহল খুলেছিল আটচল্লিশ সালে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অদূরে কয়েক বাঁধ টিন দিয়ে ছোট্ট

একটা চায়ের দোকান খুলে সামাদ মিঞা তার রেস্তোরার নাম রেখেছিল জিন্নৎ মহল।

নড়বড়ে বেঞ্চ আর টিনের চালার জিন্নৎ মহলের দিকে তাকিয়ে সেদিনের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অনেকেই হাসতো।

হিন্দুস্থানের উত্তর প্রদেশের পোড়-খাওয়া সামাদ মিঞাও সেদিন তার পানের ছোপলাগা দাঁত বের করেই সেই হাসির উত্তর দিত। কিন্তু তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল জিন্নৎ মহলের টিনের চালার পরিবর্তে ইঁট-কাঠ-লোহার দালান একদিন হবেই।

পঞ্চাশ সালের স্বুরুতেই জিন্নৎ মহলের খোল নলচে বদল হল।

জিন্নৎ মহল আজ আর শুধু রেঁস্তোরাই নয়। রেঁস্তোরার আগে হোটেল কথাটা যুক্ত হয়ে বিশালাকার এক বহুবর্ণের সাইনবোর্ড ঝুলছে তিনতলা মহলের একেবারে ওপর তলায়। সামাদ মিঞা আজো হাসে পানের ছোপলাগা দাঁত বের করে। সিকি আধুলি ঠুকে ঠুকে ক্যাশ বাক্সে তুলে রাখার সময় সামাদ মিঞার অনেকগুলো দাঁত বেরিয়ে আসে।

উনিশশ' সাতচল্লিশের জিন্নৎ মহলের সঙ্গে আজকের জিন্নৎ মহলের যদি কোন মিল থাকে তা হল সামাদ মিঞার ঐ পানের ছোপ লাগানো ক'টা দাঁত। সেদিনের সব ক'টা দাঁত আজো অটুট আছে সামাদ মিঞার।

আজকের জিন্নৎ মহলে ঢুকলেই দু'পাশে সারিসারি কেবিন চোখে পড়ে। মাঝখানে টেবিলগুলো তাদেরই জন্যে যারা জেনানা-বিহীন হয়ে আসে।

দশটা বাজার পর থেকেই জিন্নৎ মহল চলে যায় ছাত্রদের কব্জায়। সন্ধ্যের আগে সেখানে অন্য সমাজের লোক ঢোকে সাধ্য কি!

সামাদ মিঞাও কিছুদিন ধরেই এই সময়টা অনুপস্থিত থাকছে। তখন দূর সম্পর্কের এক ভাইপো এসে বসে ক্যাশবাক্স নিয়ে।

ছাত্রদের সাথে আজকাল ছাত্রীরাও আসে জিন্নৎ মহলে। ছাত্রদের সঙ্গে একই কেবিনে বসে কফির পেয়ালায় তুফান তোলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

ঢাকা শহরের অন্যতম আকর্ষণ এই জিন্নৎ মহল।

বছর দেড়েক আগে জিন্নৎ মহলেরই এক কেবিনে এক দুপুরে এসে হাজির হয়েছিল তিনটি ছেলে আর দু'টি মেয়ে।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনেও এসেছিল তারা।

তারপর রোজ আসতো।

কিছুদিন আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিল তারা।

ঢাকার সব চেয়ে নামী ও দামী ব্যারিষ্টার আফাক চৌধুরীর মেয়ে রোশনারা চৌধুরীকে অবশ্য অনেকেই চিনতো। চিনতো তার জ্ঞাতি ভাই সুলতান চৌধুরীকেও। অপর তিনজন লাইলী ইসলাম, হারুন সরকার আর অভিজিৎ রায় ছিল অপরিচিত।

পর্দা ফেলে অবসর সময়ের অধিকাংশই ওরা কাটিয়ে যেতো জিন্নৎ মহলের একটা নির্দিষ্ট কেবিনে।

অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা উৎসুক হয়ে ঘোরাফেরা করত পাশের কেবিনে, আশেপাশের চেয়ারে ওদের কথা শুনবার জন্যে, ওদের আলাপের আভাষ নেবার জন্যে।

দ্বিতীয় বছরের সুরুতে দেখা গেল ছাত্র ইউনিয়ানের নেতৃত্ব গেছে রোশনারা চৌধুরীর হাতের মুঠোয়।

একমাত্র প্রতিযোগী রফিকুল ইসলামের কণ্ঠ বোবা হয়ে গেছে রোশনারা চৌধুরীর ইস্পাৎধার যুক্তির কাছে, রফিকের ফলোয়ারেরা অধিকাংশই দল ভেঙে রোশনারার অনুগামী হয়েছে তার আবেগপূর্ণ বক্তৃতায়, তার বিদ্যুতের মত রূপের মোহে।

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে তখন এক নতুন আওয়াজ উঠেছে, অবাঙালী বাংলা ছাড়ো। বাংলার মানুষ আগে বাড়ো।

আইয়ুব খাঁ-র ন'বছরের স্বৈরতন্ত্র পূর্ব বাংলাকে ছোবড়ায় পরিণত

করে সমস্ত দৌলত জমা করেছে পশ্চিম পাকিস্তানে। পাকিস্তানের ফিনান্সিয়াল স্ট্রেন্থ জড়ো হয়েছে মাত্র কুড়িটা পরিবারের কব্জায়।

পূর্ব বাংলার শাসন ক্ষমতা পাঞ্জাবীদের দখলে।

ব্যবসা করছে বালুচ পাঠানের দল।

নিরন্ন বাংলার মানুষ তাই মরীয়া হয়ে চাইছে প্রতিকার। প্রতিকারের একমাত্র উপায় শাসন ক্ষমতা। বাংলার মানুষ তাই তুলেছে স্বায়ত্বশাসনের দাবী।

বাংলার নেতৃত্ব ও তাদের সোচ্চার কণ্ঠ দুলিয়ে দিয়েছে আয়ুবশাহী তক্ত।

সেদিন ঠিক দুটোর সময় ওরা এলো জিন্নৎ মহলে।

রোশনারা চৌধুরী, সুলতান চৌধুরী, অভিজিৎ রায় আর লাইলী ইসলাম ও হারুন।

রোশনারা চৌধুরী একটু বিচলিত।

মেরুন রঙের ভারী সিল্কের শাড়ী আর সাদা ব্লাউজ গায়ে।

হাতে শাড়ীর সঙ্গে ম্যাচকরা মেরুন রঙেরই একটা প্লাস্টিক কভার খাতা নিয়ে কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা ঢুকে গেল কেবিনের মধ্যে।

পিছন পিছন অনুসরণ করল সুলতান চৌধুরী, অভিজিৎ রায় আর লাইলী ইসলাম।

সামাদ মিঞা রাজনীতি না বুঝলেও এটুকু বেশ ভাল করেই হৃদয়ঙ্গম করেছে যে ঐ মেয়েটির একটি মাত্র ইসারায় তার জিন্নৎ মহল ধূলোয় মিশে যেতে পারে।

কর্মচারীদের তাই ঢালাও হুকুম দিয়ে রেখেছিল, কেবিনটা যেন সব সময় খালি রাখা হয়। কর্মীরা নির্দেশ পালন করে চলত।

ছাত্ররাও কেউ অনধিকার প্রবেশ করত না ঐ কেবিনে।

ওরা আসন গ্রহণ করার সাথে সাথেই বেয়ারা এসেছিল অর্ডারের জন্য।

সুলতান চার কাপ কফির অর্ডার দিয়ে পকেট থেকে দিনের সংবাদপত্র বের করে টেবিলে মেলে ধরল। তারপর এক জায়গায় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, ভাসানী সাহেবকে ওরা দৈহিক নির্যাতন করতে পর্যন্ত দ্বিধা করেনি রোশন।

রোশনারা কোন উত্তর দিল না, কিন্তু দৃষ্টি ওর সংবাদপত্রের দিকে নিবদ্ধ।

বেয়ারা কফির পেয়ালা পরিবেশন করে গেল।

কফির পেয়ালা নিজের কোলে টেনে নিয়ে অভিজিৎ মুচকে হেসে উঠলো।

রোশনারা লক্ষ্য করেছিল অভিজিতের হাসি।

নিজেও সামান্য একটু হেসে বলল, রাজনীতি আর সাহিত্য অঙ্গাঙ্গি জড়িত হলেও কোথায় যেন দুয়ের মধ্যে বিরাট এক পার্থক্য আছে। সাহিত্য রাজনীতির অনেক সময় বাহক হয়ে ওঠে। তাই সাহিত্য বাদ দিয়ে রাজনীতি সফল হতে পারে না। কিন্তু তবু আমার মনে হয় সাহিত্য আর রাজনীতির মধ্যে এক দুস্তর এমনকি প্রশান্ত মহাসাগরের ব্যবধান।

রোশন তুমি সাহিত্যকে মাঝে মাঝে অনেক বড় করে দেখে থাকো।

সুলতান চৌধুরী একটা সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেট থেকে একটা তুলে হারুনের আঙুলের মধ্যে গুঁজে দিয়ে প্যাকেটটা অভিজিতের সামনে ঠেলে দিয়ে বলল, তোমার চলবে নাকি সাহিত্যিক? কিন্তু সাবধান অভিজিৎ, একটান দিয়েই আজ কিন্তু মোপাসাঁ অথবা চেকভকে টেনে আনতে পারবে না। আজকের আবহাওয়া অত্যন্ত সিরিয়াস। দেখছো না রোশনের মুখের দিকে তাকিয়ে, ঝড় উঠতে পারে?

রোশনারা তো দিব্যি হাসছে সুলতান, তুমি ওর মুখে ঝড়ের কি দেখলে? লাইলী প্রতিবাদের সুরে বলে।

সিগারেটে বেশ দীর্ঘস্থায়ী একটা টান দিয়ে সুলতান বলল, রোশনের মুখের ভাষা বুঝতে হলে তার হৃদয়ের দিকে তাকাতে হয় লাইলী। কারণ রোশনের মুখে সবসময় একটা মুখোশ আঁটা থাকে।

রোশনারা এতক্ষণ চুপচাপ সুলতানের কথা শুনছিল। সুলতান থামলে একবার অভিজিৎ ও আর একবার সুলতানের মুখের দিকে তাকিয়ে আবার হেসে উঠে কফির পেয়ালায় চুমক দিতে সুরু করল।

লাইলী এবার সুযোগ পেয়ে বলল, এবার বলো সুলতান, এবার হাসছে কে—রোশনারার মুখ অথবা মুখোশ?

নিজের পাতা ফাঁদে নিজেই ধরা পড়তে চলেছে সুলতান।

তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, ভাসানী সাহেবকে ওরা বোকা পেয়ে অপমান করবে আর আমরা সেই সংবাদ পাবার পরও রেঁস্তোরায় বসে হাসি-মস্করা করব।

কফির পেয়ালা থেকে মুখ তুলে রোশনারা বলল, এখানেই রাজনীতি আর সাহিত্যের মধ্যে তফাৎ সুলতান। অথচ কি জানো, রাজনীতি বাদ দিয়ে সাহিত্য চলতে পারে, বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু সাহিত্য বাদ দিয়ে রাজনীতি চললেও বেঁচে থাকা অসম্ভব।

অভিজিৎ একমনে কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে যাচ্ছিল।

হঠাৎ রোশনারার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার কাপ একেবারে শূণ্য করে খেয়ো না রোশনারা। রাজনীতি করতে গিয়ে সাহিত্যকে টুঁটি টিপে হত্যা করো না।

রোশনারার কাপের অর্ধেক তখনো ভরা।

কাপটা ঠেলে সরিয়ে রেখে রোশনারা হাসলো—

তোমার কথাই থাক সাহিত্যিক।

সুলতানের কণ্ঠ এবার বেশ কিছু উচ্চগ্রামে ওঠে, যা বলবার খুলে বলবে তোমরা এইটাই আমি আশা করি।

হিংসে অনেক সময় দৃষ্টি থাকতেও মানুষকে অন্ধ করে রাখে সুলতান।

রোশনারা ঠেলে দেওয়া কফির পেয়ালাটা আবার বুকের কাছে টেনে নেয়। যেখান দিয়ে শাড়ীর আঁচলটা নারীর অন্যতম সৌন্দর্যকে ঘিরে কাঁধে উঠে গেছে।

কিছু দেখতে পাচ্ছো সুলতান?

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রোশনারা চাইলো সুলতানের মুখের দিকে।

কফির পেয়ালাটা তখনো তার হাতে ধরা।

সুলতান কঠিন দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করল রোশনারাকে।

তর্ক তোলার মত অথবা অযথা হেসে ওঠার মত আমি কিছুই দেখছি না।

হাতের অবশিষ্ট সিগরেটে প্রচণ্ড এক টান দিল সুলতান।

তুমি দেখতে পাবে না সুলতান। কারণ রাজনীতি ও সাহিত্যে অনেক যে পার্থক্য। রোশনারার কঠিন দৃষ্টি ঈষৎ স্তিমিত হয়ে আসে।

সুলতান তাকায় অভিজিতের মুখের দিকে।

বড়লোকের সৌম্যদর্শন ছেলে অভিজিৎ রায়। গায়ের রং ফরসা নয়ই বললে চলে। ওর চেয়ে নিজেকে অনেক বেশী সুন্দর বলে জানে সুলতান। ওর ধবধবে সাদা রং মুখের নিখুঁত শার্প কাটিং পরণের দামী টেরিলিন সার্ট ও প্যান্ট সব মিলিয়ে সুলতান চৌধুরী। অনেক বেশী স্মার্ট ঐ ধূতি পানজাবী পরা সাহিত্যিক অভিজিৎ রায়ের চেয়ে।

অভিজিতের দিকে নয়, আমার দিকে তাকাও সুলতান।

চেয়ারের ওপর সোজা হয়ে বসল রোশনারা।

কফির পরিত্যাক্ত অংশটুকু এক চুমুকে নিঃশেষ করে ফেলল হঠাৎই। তারপর শূণ্য পেয়ালাটা আবার বুকের কাছে টেনে এনে বলল, এবারো হয়তো তুমি কিছু বুঝবে না সুলতান।

কোন কিছু না বুঝেই আবার তাকালো সুলতান রোশনারার দিকে।

আমার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখো সুলতান, অঙ্গে আমার মেরুন সিল্ক, হাতে মেরুন রঙের চুড়ি, টেবিলের ভ্যানিটি ব্যাগটা যদি লক্ষ্য কর দেখবে ওটাও মেরুন রঙের।

রোশনারার মুখে আবার হাসি দেখা দেয়—

কি, এবার কিছু বুঝলে ?

সুলতান হেসে ওঠে, সব মিলিয়ে আশ্চর্য সুন্দর লাগছে তোমাকে রোশন।

আমার চাচাতো ভাই তুমি সুলতান, কিন্তু চাচার এবং আমার উভয়েরই তুমি নাম ডোবালে।

কি রকম ?

সুলতান প্রশ্ন করল।

তোমার দৃষ্টিভঙ্গী আরো একটু তীক্ষ্ণ হলে আরো সুন্দর দেখতে পেতে আমাকে।

অভিজিৎ কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতেই তা দেখেছিল, আর তাই তো হেসে ছিল সুলতান।

সুলতান যেন তার সর্বগ্রাসী দৃষ্টি দিয়ে দেখতে সুরু করল রোশনারাকে।

তোমার ঐ সুন্দর বড় বড় চোখ দুটো দিয়ে রোশনারা চৌধুরীকে গিলে ফেললেও তুমি সেরূপ দেখতে পাবে না সুলতান, তাই বলছিলাম, সাহিত্যিক সাহিত্যিকই।

আচ্ছা বাবা, হার স্বীকার করছি। এবার বলো রোশন—

কফি। বুঝলে ?

সুলতান এবং লাইলী ও হারুন একসঙ্গে চাইলো রোশনারার মুখের দিকে। অভিজিৎ মুচকে মুচকে হাসছে।

আমরা অযথা সময়ের অপব্যয় করছি সুলতান।

ধীরে ধীরে গম্ভীর হয়ে যায় রোশনারা।

চোখের দৃষ্টিও ওর বদলাতে সুরু করে।

কি যেন বলতে গিয়েও রোশনারার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে যায় সুলতান। চুপ করে যায় অভিজিৎ, লাইলী আর হারুনও।

বেয়ারা এসে দাঁড়াতে ইসারায় দ্বিতীয় দফায় কফি দিয়ে যেতে বলে দেয় হারুন।

রোশনারার দৃষ্টি তখন খবরের কাগজের পৃষ্ঠার ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মুজিবর রহমান সাহেব ফিরে এসেছে। এবার ভাসানী সাহেব ফিরে এলে দেশে আগুন লাগবে সুলতান। আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি এ আগুন থামাবার শক্তি পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান সরকারের নেই।

হঠাৎ কাগজখানা বন্ধ করে রোশনারা বলে উঠলো, ভাসানী সাহেব নীরবে কিছুতেই অপমান সহ্য করবেন না। দেশে ফিরে বদলা তিনি নেবেনই। আর সেই সুযোগ আমাদের নিতে হবে সুলতান। দেশে যদি সত্যি সত্যিই আগুন জ্বলে ওঠে, সেই আগুনে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে দেশের সমস্ত আগাছা কুগাছা।

একটু থামলো রোশনারা।

হাঁপিয়ে উঠেছিল উত্তেজনায়।

মালিক থেকে চাকর পর্যন্ত সকলেই চুষে নিচ্ছে দেশটাকে। যে যেখানে সুযোগ পাচ্ছে খাবলা বসাচ্ছে। বেওয়ারিশ মাল হয়ে গেছে যেন আমাদের এই দেশ। বাড়ীর মালিক না থাকলে যেমন হয় পূর্ব পাকিস্তানের হয়েছে সেই অবস্থা।

হঠাৎ টেবিলের ওপর সজোরে মুষ্ঠাঘাত করল রোশনারা।

তুই-ই থামিয়ে দিতে হবে ওদের ঐ পশ্চিমীদের শাসন ও শোষণ।

ঝনঝন করে হাতের মেরুন রঙের চুড়িগুলো ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল সামাদ মিঞার জিন্নৎ মহলের শ্বেত পাথরের টেবিলের ওপর।

সেদিকে তাকিয়ে অপ্রস্তুতের হাসি হাসলো রোশনারা।

রোশনারার দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে অভিজিতের ওপর।

নির্বাক শ্রোতার মত বসেছিল অভিজিৎ।

ওর দিকে তাকিয়ে রোশনারা বলল, তোমার সাহিত্যে আমি আঘাত করে ফেললাম অভিজিৎ।

মৃদু হাসলো অভিজিৎ।

যুগে যুগে বারে বারে আঘাতের পর আঘাত সহ্য করেও সব দেশের সাহিত্য মাথা উঁচিয়ে আছে রোশনারা।

আচ্ছা সাহিত্যিক, তোমার কলমে এমন কিছু লিখতে পারো না যা পড়ে দেশের মানুষ নিজেরাই সচেতন হয়ে উঠবে। নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সজাগ হবে? গ্যেটে যে সাহিত্য রচনা করে একটা জাতকে উদ্‌বুদ্ধ করে গিয়েছিল! লেখো সাহিত্যিক তেমনি কোন লেখা, যে লেখায় আগুন জ্বলবে। যে আগুনে শতাব্দীর জড়তা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রোশনারা আবার নিজে নিজেই বলল, পড়বে কে সেই সাহিত্য? দেশের মানুষকে যে মূর্খ করে রেখেছে সরকার।

টেবিলে হয়ত আরো একটা ঘুসি মারতে যাচ্ছিল রোশনারা। নিজেকে থামিয়ে নিয়ে হেসে বলল, উত্তেজিত হলে কোন রকম জ্ঞান থাকে না অভিজিৎ।

দু'দিনের মধ্যে ভাসানী সাহেব ফিরে এলেন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে।

দেশে ফিরে হুংকার ছাড়লেন, যদি স্বায়ত্বশাসন দেওয়া না হয় দেশে রক্ত-নদী বইয়ে ছাড়বেন। ভাসানী সাহেবের নিগ্রহের সংবাদে দেশ আগে ত তেতে ছিল। এবার যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি হল।

সমগ্র দেশে যেন গণ-বিদ্রোহের রূপ নিল।

শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ার মত।

পুলিশের ওপর পরপর কয়েক স্থানে জনতা চড়াও হতেই পুলিশ ডিউটিতে যেতে অস্বীকার করে বসল।

দেশের এই পরিস্থিতির মধ্যেই রোশনারা চৌধুরী ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মিটিং ডাকলো। ছাত্রছাত্রীরা তাদের প্রিয় নেত্রীর আহ্বানে ক্লাস বর্জন করে সমবেত হল ময়দানে। ছাত্র ছাড়াও এই সমাবেশে বাইরেরও অনেক মানুষ যোগ দিল।

জনমত এক নতুন নেতৃত্বের কামনায় উদ্‌গ্রীব।

রোশনারা চৌধুরী ধীরে ধীরে মঞ্চে গিয়ে উপস্থিত হল।

উপস্থিত বিশাল জনতা সর্বাঙ্গে কালো পোশাক পরা রোশনারার দিকে তাকিয়ে আছে। তারা আজ নতুন কিছু শুনতে চায়।

বিশাল জনতাকে সম্বোধন করে রোশনারা বললো, ভাইসব, আমরা স্বপ্ন দেখে এসেছি ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা সোনার বাংলাদেশ। আমরা আমাদের শাসনকর্তার ভূমিকায় দেখতে চেয়েছি আমাদেরই মানুষ। তাই আমরা লড়াই করেছি বণিক ইংরেজের বিরুদ্ধে, দাঙ্গা করেছি হিংসাপরায়ণ প্রতিবেশীর সঙ্গে। অনেক খুন ঝরেছে দেশের মানুষের। বার বার লাল হয়েছে পদ্মা ও মেঘনার জলরাশি। কিন্তু বিশ বছর পরে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? বলুন আপনারা আমরা কি দেখছি?

বিশাল জনতা যেন মন্ত্রমুগ্ধ। এতটুকু গোলমাল নেই।

মুহূর্তখানেকের নীরবতা ভঙ্গ করে রোশনারা যেন ক্রুদ্ধ বাঘিনীর মত গর্জন করে উঠলো: আমরা দেখছি ইংরেজ বিতাড়িত হয়েছে কিন্তু তার শূণ্যস্থান দখল করেছে পাঠান ও পানজাবীর দল। সেখানে বাঙালীর কোন স্থান নেই। আমরা চেয়েছিলাম আমাদের দেশ ধন ধান্যে পূর্ণ হোক। এখন দেখছি যে, সামান্য কিছু যা আমাদের দেশে আছে আগে তা যেতো সাগর পার হয়ে বিলেতে। এখন তা যাচ্ছে লাহোর, পেশোয়ার, করাচী। আমরা চেয়েছিলাম আমাদের শাসন করবে আমাদেরই লোক। কিন্তু দেখছি আমাদের

বুকের ওপর বসে বুট দিয়ে পিষছে পানজাবী অথবা কোন বিহারী। ধর্মের দোহাই দিয়ে ওপরওয়ালারা আমাদের চোখে ঠুলি বাঁধবার জন্যে চীৎকার করে উঠেছে—ইসলাম বিপন্ন। আর তার প্রতি-বিধানের জন্যে আমরা ছুরি চালাচ্ছি প্রতিবেশী বাঙালীর বুকে। আগুন জ্বালিয়ে ছারখার করে দিচ্ছি তার সংসার। সে প্রাণভয়ে, ইজ্জতের ভয়ে ছুটছে হিন্দুস্থান। এইসব একবারো কি আমরা ভেবে দেখেছি আমরা কাদের বুকে ছুরি চালিয়েছি?

রোশনারা চীৎকার করে উঠলো : না, তা আমরা দেখিনি।

যারা আমাদের বিপদে সহায় হতে পারতো, যারা আমাদের আপদে পাশে এসে দাঁড়াতো তাদের আমরা উচ্ছেদ করে চলেছি। আমরা কোনদিন ভেবে দেখিনি কেন এমন করছি। আজ আমাদের মুখের ভাষা পর্যন্ত ওরা কেড়ে নিতে চেয়েছে। চীৎকার করে বলেছে, ওটা কাফেরের ভাষা। একবার ভেবে দেখুন কতবড় ধোকাবাজী রয়েছে এর পেছনে।

রোশনারার কথা শেষ হয়নি হঠাৎ জনতার শেষ প্রান্ত থেকে চীৎকার উঠলো : পুলিশ আসছে।

অনেকেই ছুটোছুটি সুরু করে দিল পুলিশের নামে।

হাতের মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরল রোশনারা মাইকের রড।

যত জোর ছিল তার গলায় চীৎকার করে উঠলো।

যদি সাহস থাকে ভাইসব প্রতিরোধ করুন ঐ পুঁজিবাদের রক্ষকদের।

যদি ক্ষমতা থাকে শায়েস্তা করুন ঐসব অত্যাচারীদের।

শুধু পুলিশ নয়, পুলিশের সাহায্যার্থে এসেছে গাড়ী গাড়ী ই. পি. আর।

পুলিশ এসেই কোন রকম সতর্কতার সুযোগ না দিয়ে কাঁদানে গ্যাস ছুড়তে সুরু করে দিল। জনতার মধ্য থেকে একদল এগিয়ে

গেল ইঁট পাথর লাঠি যা পেল হাতের কাছে তাই নিয়ে পুলিশের মোকাবিলা করতে।

চারিদিকে প্রচণ্ড কোলাহল।

রোশনারা তখনো দাঁড়িয়ে আছে মাইকের সামনে।

রোশনারা তখনো চীৎকার করছে, পুলিশ পুঁজিবাদের দালাল, ক্ষমা করবেন না।

এদিকে ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে আসছে।

যে আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা বিপর্যস্ত হয়ে গেছে।

পুলিশ ক্রমশই এগিয়ে আসছে মঞ্চের দিকে।

জনতা পিছু হটতে স্নুরু করেছে।

গুড়ুম।

পুলিশ গুলি চালিয়েছে।

গুলি, গুলি—একসঙ্গে অনেক লোক চীৎকার করে উঠলো।

আক্রোশে ফেটে পড়ল রোশনারা। কিন্তু করার কিছু নেই।

কাঁদানে গ্যাসের প্রভাবে চোখ জ্বলতে স্নুরু করেছে।

গুড়ুম, গুড়ুম।

রোশনারার কিছু দূরেই কয়েকজন আর্তনাদ করে উঠলো।

স্নুলতান ?

রোশনারা চারিদিকে তাকালো কিন্তু মঞ্চের ওপর স্নুলতানকে দেখতে পেলো না।

হারুন ছুটে গেল গুলির শব্দে।

মঞ্চের ওপর শুধু একা রোশনারা।

চোখ দুটো বার বার জলে ভরে উঠছে।

রুমাল দিয়ে বার বার মুছেও কিছু দেখতে পাচ্ছে না রোশনারা।

গোলমাল ক্রমশই মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছে।

স্নুলতান ?

আবার চীৎকার করে উঠলো রোশনারা।

এখানে থাকলে যে কোন মুহূর্তে বিপদ আসতে পারে। বিপদ শুধু পুলিশের তরফ থেকেই নয়। যাদের জন্য রোশনারা চীৎকার করে মরেছে বিপদ তাদের দিক থেকেও আসতে পারে।

ওদের চরিত্র ভাল করেই জানে রোশনারা। যে কোন সময় পাশব প্রবৃত্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে।

ঝাপসা চোখে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না রোশনারা।

অন্ধকার হয়ে আসছে চারিদিকে।

সুলতানের জন্য অপেক্ষা না করে মঞ্চ থেকে নামতে গেল রোশনারা। ইউনিভারসিটির গোলমাল শহরেও ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাড়ী বেশ দূরে। দেরী করলে বিপদ হতে পারে। পা বাড়াতে গিয়ে রোশনারার ডান পা-খানা জড়িয়ে গেল মাইকের তারে।

ছাড়াবার সময় নেই। পেছনে হুড়মুড় করে বেশ কিছু লোক মঞ্চের চৌকির ওপর উঠে পড়েছে। এক্ষুনি হয়ত ঘাড়ের ওপর এসে পড়বে।

তাড়া করে এই দিকেই এগিয়ে আসছে পুলিশ।

আঃ।

আর্তনাদ করে ওঠে রোশনারা।

দৈহিক শক্তিতে মেয়েরা এতো কমজোর!

সুলতানও সময় বুঝে কেটে পড়েছে।

টানাটানি করতে গিয়ে তারগুলো আরো জোরে পায়ে জড়িয়ে পড়ল।

আর একটু হলেই ঘাসের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ত রোশনারা। ঠিক সেই মুহূর্তেই দুটো শক্ত হাত ধরে ফেললো রোশনারাকে।

কে?

চমকে উঠলো রোশনারা।

ভয় নেই রোশনারা। আমি অভিজিৎ, তোমার সাহিত্যিক।

অভিজিৎ, তুমি! আমাকে তাড়াতাড়ি বাইরে নিয়ে চলো অভিজিৎ।

অভিজিৎ ইতঃস্তত করছিল—

তাকে বাধা দিয়ে রোশনারা বলল, কোন দ্বিধা কোরো না অভিজিৎ, দেরী করলে বিপদ তোমাকেও স্পর্শ করবে।

অভিজিৎ রোশনারাকে কাঁধে তুলে একরকম ছুটতে সুরু করল।

একটা ঘোড়ার গাড়ি নবাবপুর রোড দিয়ে ছুটছে।

গাড়ির দু'সিটে দু'জন সওয়ারী।

রোশনারা আর অভিজিৎ।

দু'জনেই চুপচাপ। কারো মুখে কথা নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলমাল এখন পর্যন্ত এদিকে আসেনি।

রাস্তায় আলো জ্বলেছে, দোকান খুলেছে।

রাস্তার আলোয় রোশনারা দেখতে পেলো অভিজিতের গায়ের পানজাবী ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে গেছে।

অভিজিৎ সিটে হেলান দিয়ে চোখ বুঁজে বসে আছে।

চোখ দু'জনেরই জ্বালা করছে একটু একটু।

মনের মধ্যে ঝড় বইছিল রোশনারার।

মস্তবড় অঘটন আজ ঘটে যেতে পারতো।

পুলিশের ভয় রোশনারা করে না। কিন্তু ইজ্জতের ভয়, সম্মানের ভয় তার আছে। সময়মত অভিজিৎ এসে না পড়লে তেমনি কোন বিপদ এসে পড়া অসম্ভব ছিল না।

অভিজিতের দিকে চাইলো রোশনারা।

নির্বিকারচিত্তে চোখ বুঁজে বসে আছে।

অভিজিৎ?

কি?

নতুন কিছু লিখছো আজকাল? অনেকদিন তোমার লেখার খবর নেওয়া হয়নি।

ক্রমশই যেন রাজনীতির আবর্তে জড়িয়ে পড়ছি।

লেখায় অনেকদিন হাত দিতে পারিনি রোশনারা।

তোমার তো কোন অসুবিধে নেই?

আছে বৈকি রোশনারা। সঙ্গদোষ। তুমি ঠিকই বলেছিলে। এমন সাহিত্য রচনা করতে হবে যে সাহিত্য মরা মানুষকে পর্যন্ত নাড়া দিয়ে তুলবে।

রোশনারার কথাগুলো মাঝে মাঝে আঘাত করে, তাই না অভিজিৎ?

আঘাত করে কিনা জানি না। তবে রোশনারার কথা মনের মধ্যে যে ঝড় তোলে তাতে কোন ভুল নেই।

ঝড়কে যদি এতোই ভয় সরে যেতে পারো ঝড়ের থেকে অনেক দূরে।

ভয় তো ঝড়কে নয়, রোশনারা।

হঠাৎ অভিজিৎ পাল্টা একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, তুমি এমন করে নিজেকে রাজনীতির আবর্তে টেনে আনছো কেন রোশনারা? আর ক'দিন পরে তোমার বিয়ে হবে! সুলতান আর তুমি নতুন জীবন গড়ে তুলবে—সেই কি ভাল নয়?

সুলতানের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে একথা ঠিক অভিজিৎ।

রুমালে দুটো চোখই ভাল করে মুছে নিল রোশনারা।

আমার বাবা আর সুলতানের বাবা আমার জন্মেরও আগে এই বিয়ে স্থির করে রেখেছেন। আমিও বুঝি, নির্ধারিত পথেই যখন আমাকে চলতে হবে। কি প্রয়োজন এই লড়াইয়ের। কি প্রয়োজন এতো ঝুঁকি নেবার।

একটু থেমে হয়ত কিছু ভেবে নিয়েই আবার বলল, আমিও অনেক ভাবি এসব নিয়ে। অবসর মুহূর্তে নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকবার প্রশ্নও করি কি লাভ এত সবের। সঙ্গে সঙ্গে মন কি উত্তর দেয় জানো?

রোশনারা ঝুঁকে বসল সামনের দিকে।

কি?

অভিজিৎ তেমনি নির্লিপ্ত।

সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে ভেসে ওঠে সামাদ মিঞার জিন্নৎ মহলের ঐ কেবিনটা। আর আমার সকল ভাবনা-চিন্তার অবসান ঘটে।

হো-হো করে বেশ জোরেই হেসে উঠলো রোশনারা।

অভিজিতের বুঝতে একটুও অসুবিধে হয় না কি যেন বলতে গিয়েও কথার মোড় ঘুরিয়ে অন্য প্রসঙ্গ পেড়েছে রোশনারা।

নিজেকে অভিজিৎও বাঁচিয়ে নেয়—

সামাদ মিঞার জিন্নৎ মহলের একটা কেবিন ইতিহাসের পাতায় না হলেও অনেকের মনের পাতায় অক্ষয় হয়ে থাকবে রোশনারা।

সত্যিই যাদু আছে ঐ কেবিনে তাই না অভিজিৎ? দুপুর হলেই মনকে আকর্ষণ করে। তেমনিই হাসতে থাকে রোশনারা।

আর মনের টানে উপস্থিত হয় রোশনারা চৌধুরী, রোশনারা চৌধুরীর আঁচল ধরে সুলতান চৌধুরী, হারুন, লাইলী আর এক অখ্যাত সাহিত্যিক অভিজিৎ রায়।

আঁচল ছেড়ে সময়মত আবার পালাতেও পটু ঐ সুলতান চৌধুরী। সত্যি আমি ভেবে পাচ্ছি না আমাকে অমন বিপদের মধ্যে ফেলে কি করে চলে যেতে পারলো!

এখন পেরেছে কিন্তু পরে হয়ত পারবে না রোশনারা। গাঁটছড়া শক্ত করে বাঁধা হলে মিঞা যাবে কোন্ পথে?

যারা পালাতে চায় তারা গাঁটছড়া কেটেও পালাতে পারে অভিজিৎ।

অভিজিৎ এবার কোন উত্তর দেয় না।

আচ্ছা অভিজিৎ, তুমি কখনো কোন মেয়েকে ভালবেসেছো?

আলো ঝলমলে বিকতাব মহল পার হয়ে যাবার সময় একটা মোটা আলোর রেখা রোশনারার মুখের ওপর দিয়ে ঘুরে গেল।

অভিজিৎ পথের আলোয় রোশনারার মুখের দিকে তাকায়।

সুন্দরী অভিজাত সুশিক্ষিতা রোশনারার প্রেমে পড়ে ঢাকা শহরের অনেকেই হাবুডুবু খেয়েছে। রোশনারার প্রেমিকের সংখ্যা আকাশের তারার মতই গুণে শেষ করা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থেকে প্রফেসার পর্যন্ত অনেক মিঞাই ডুবে আছে রোশনারার চিন্তায়।

শক্ত পাথর হয়ে নিজেকে সমস্ত রকম আক্রমণ থেকে বার বার রক্ষা করেছে রোশনারা। পাথরের বুকে আঁচড় কাটা সম্ভব কিন্তু রোশনারার হৃদয়ে আজ পর্যন্ত একটি দাগও কাটেনি! এমনি শক্ত মেয়ে ঐ রোশনারা।

সেই রোশনারা অভিজিৎকে জিজ্ঞাসা করেছে ভালবাসার কথা।

কি? উত্তর দিচ্ছো না কেন?

ভাবছি কি উত্তর দেবো।

অর্থাৎ মনে মনে যাকে তুমি ভালবেসে এসেছো, রোশনারা চৌধুরীর কাছে তাকে প্রকাশ করবে কি না? ভয় নেই অভিজিৎ, তোমার প্রেমিকার কথা, রোশনারা কথা দিচ্ছে, কাউকে বলবে না।

যে নিজেকে ভালবাসতে পারে না সে অপর কোন মেয়েকে ভালবাসবে, তাই কখনো হয় রোশনারা?

তার মানে তুমি বলতে চাইছো, কাউকে মনে ধরেনি?

তা হয় না রোশনারা। তবে যৌন আকর্ষণকে যদি তুমি ভালবাসা বলতে চাও আমি তাকিয়েছি। আমাদেরই বাড়ীর সামনের একটা মেয়ে যখন সর্বাঙ্গে ঢেউ খেলিয়ে কলেজ যাতায়াত করে তখন দৃষ্টি গিয়ে পড়ে মেয়েটার দেহের কার্ভে কার্ভে। আর তার জন্যে তুমি আমাকে দোষ দিতে পারো না। দোষ যদি দিতেই হয় সে দোষ আমার আদিম প্রবৃত্তির। আমার হৃদয়ের নয়।

রোশানারা বাইরের দিকে তাকিয়েছিল।

হঠাৎ একসময় উত্তেজিত হয়ে বলল, গাড়িটা কিছুক্ষণের জন্যে থামাতে বল অভিজিৎ।

গাড়ি থেমে গেল।

রোশনারা গাড়ি থেকে নেমে বলল, তুমি একটু অপেক্ষা করবে অভিজিৎ?

পরক্ষণেই কি ভেবে বলল, অপেক্ষাই বা করবে কেন, তুমিও এসো। গাড়ি ততক্ষণ অপেক্ষা করুক। কারণ তোমার যা অবস্থা হেঁটে অতদূর যাওয়া যাবে না। এখন কতদূরে যেতে হবে?

নিজের দিকে তাকালো অভিজিৎ।

সামনের গলিতে ঢুকেই দুটো বাড়ীর পরের বাড়ী। তাছাড়া আমি যখন তোমাকে নিয়ে যেতে চাইছি তখন তোমার অত চিন্তার কি আছে?

সত্যিই তো! তুমি যখন সঙ্গে রয়েছো খালি গায়ে গেলেও আমার আপত্তি কিসের।

এই অসভ্য! রাস্তায় লোক জমে যাবে তাড়াতাড়ি এসো।

গলিতে মিটমিট করছে খুব বেশী হলে চল্লিশ ওয়াটের একটা বাল্ব।

আমরা কি মুর্শিদকুলী খাঁর আমলে ফিরে চলেছি?

দু'পাশের দাঁত বের করা বাড়ীগুলোর দিকে তাকিয়ে অভিজিৎ প্রশ্ন করল।

না। আমরা যাদের বিংশ শতাব্দীতেও মুর্শিদকুলী খাঁর যুগে ঠেলে দিতে চাইছি তাদের মধ্যে চলেছি অভিজিৎ।

চুপ করে গেল অভিজিৎ।

এ আর এক রোশনারা।

এই রোশনারাই ময়দানে লক্ষ জনতার সামনে আগুন ছড়ায়। এই রোশনারাই বুলেটের মুখে বুক পেতে দাঁড়ায়।

গাড়ির মধ্যে যে রোশনারা ছিল তাকে আর মাথা খুঁড়লেও ওর মধ্যে পাওয়া যাবে না।

তৃতীয় বাড়ীর সামনেই ওরা থেমে গেল।

একতলা ছোট একটা বাড়ী।

বাড়ীটা কত বছর আগে তৈরী হয়েছিল স্বয়ং বাড়ীওয়ালাও বোধহয় বলতে পারবে না।

ইটের ওপর পুরু শ্যাওলা জমেছে। কোথাও খানকয়েক ইট নেই-ই।

মিউনিসিপ্যালিটি এ বাড়ীর সামনেও একটা বাল্ব দিয়েছে।

আশেপাশে তাকিয়ে অভিজিৎ দেখলো কাছাকাছি সব বাড়ীর অবস্থাই একরূপ।

অন্য কেউ হলে রোশনারার মত মেয়েকে এই রকম একটা গলির মধ্যে ঢুকতে দেখে অবাক না হয়ে পারতো না। অভিজিৎ রোশনারাকে ভাল করে চেনে। তাই চুপচাপ রইল।

শ্রীলা।

রোশনারা কড়া নাড়লো।

কে ?

ভেতর থেকে এক মহিলা সাড়া দিলেন।

দরজাটা খুলবি শ্রীলা ?

দরজা শব্দ করে খুলে গেল। হ্যারিকেন হাতে এক মহিলা বেরিয়ে এলেন।

রোশন ! তুই এতো রাত্রে ?

মহিলার কণ্ঠে বিস্ময়।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নেমে এসে রোশনারার একটা হাত চেপে ধরল মহিলাটি।

ভেতরে চল।

দুলু ভাই কেমন আছেন ?

চল ভেতরে গিয়ে দেখবি।

এসো অভিজিৎ, লজ্জার কিছু নেই, শ্রীলা আমার ছোটবেলার বন্ধু।

অভিজিৎকে আহ্বান করে মহিলার সঙ্গে এগিয়ে গেল রোশনারা।

অগত্যা অভিজিৎকেও অনুসরণ করতে হল।

বেশ লম্বা এবং সরু একটা প্যাসেজ পার হবার পর বারান্দা দু'দিকে চলে গেছে।

সামনে উঠান।

বারান্দার মুখেই দাঁড়িয়ে পড়ল রোশনারা আর মহিলাটি।

এদিকে আসুন অভিজিৎবাবু।

অপরিচিতা মহিলার মুখে নিজের নাম শুনে অভিজিৎ বিস্মিত হল।

মহিলাটি ততক্ষণে বাঁ দিকের প্রথম ঘরের দরজার সামনে আলো উঁচু করে ধরেছে।

ও বসবে না শ্রীলা, দেখছিস না জামার অবস্থা। আমিও আর দেরী করব না।

রোশনারার কথা শুনে অভিজিৎ থমকে দাঁড়ালো

একবার ওকে দেখবি না?

ভেতরে আসুন দিদি।

ঘরের ভেতর থেকে পুরুষ কণ্ঠের আহ্বান শুনে রোশনারা বলল, দুলু ভাই যখন শুনতে পেয়েছে না গেলে ছাড়বে না। চলো অভিজিৎ।

আলোর সামনে এই প্রথম মহিলাটিকে ভাল করে দেখলো অভিজিৎ।

মহিলা বললে ভুল বলা হবে। মেয়েটা রোশনারারই বয়সী। পরনে খুবই অল্প দামের একখানা তাঁতের শাড়ী। গয়নার নাম গন্ধও নেই গায়ে। সিঁথিতে মোটা সিঁদুরের রেখা।

ভেতরে এসো অভিজিৎ, দুলা ভাইয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই।

রোশনারা ভেতরে ঢুকে পড়ল।

কেমন আছেন দুলু ভাই?

তোমার দয়ায় বেঁচে আছি বোন। জানি না কবে এই যন্ত্রণার শেষ হবে।

মহিলাটির পাশ কাটিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকলেন অভিজিৎ।

আর ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই আর্তনাদ করে উঠলো।

রোশনারার সামনে দাঁড়িয়ে যিনি কথা বলছেন তাঁর মুখের ডান-পাশে অনেকখানি জায়গার মাংস তালগোল পাকিয়ে রয়েছে।

ভদ্রলোকই বলে উঠলেন, উনি ভয় পেয়েছেন। শুনছো? ভদ্রলোককে বসতে দাও।

ইনিই আমার দুলাভাই অভিজিৎ, শ্রীলার স্বামী।

ভদ্রলোকের দিকে ঘুরে রোশনারা বলল, আমার সহপাঠি ও সাহিত্যিক অভিজিৎ রায়।

ভদ্রলোক চেয়ারের হাতল ধরে এমনভাবে দাঁড়িয়েছেন যাতে মুখের কদাকার অংশ অভিজিতের চোখে না পড়ে।

ইতিমধ্যে মেয়েটিও তার হাতের হ্যারিকেন নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকেছে।

ঘরের এক কোণে ছোট্ট একটা টেবিলে জাপানী টেবিলল্যাম্প জ্বলছে।

আমাকে দেখে প্রথমে সবাই ভয় পায়।

ঘরের একমাত্র চেয়ারে বসতে বললেন ভদ্রলোক।

নিজে গিয়ে বসলেন বিছানায়।

রোশনারা এগিয়ে এসে বলল, দুলাভাই, আপনারা দুই সাহিত্যিক আর বৈজ্ঞানিকে কথা বলুন। আমরা কয়েক মিনিটের জন্যে অন্য ঘর থেকে আসি।

অভিজিতের দিকে ফিরে রোশনারা বলল, খুব দেরী হবে না অভিজিৎ।

ওরা বেরিয়ে গেল।

সেই অবসরে খুব দ্রুত ঘরের মধ্যে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়েছে অভিজিৎ।

দারিদ্র্যের লক্ষণ আছে কিন্তু কোথাও দৈন্যের স্পর্শ নেই।

ঘরে জিনিস আছে সামান্যই কিন্তু যেটা যেখানে থাকা প্রয়োজন সেখানেই আছে।

কোন জিনিসের স্থানচ্যুতি চোখে পড়ল না।

আপনি সাহিত্যিক ?

সামান্য চেষ্টা করি লেখার।

পরিচয় যখন হল আসবেন মাঝে মাঝে। লেখার অনেক বিষয়-বস্তু পাবেন আমার মধ্যে।

আমার জীবনেই এমন সব ঘটনা আছে যা দিয়ে প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস লিখতে পারবেন।

আমার মুখের এই কুৎসিত অংশ, এর পেছনেও বিরাট এক ইতিহাস আছে।

অভিজিৎ ভদ্রলোকের কথাগুলো গিলছিল।

কথা বলা একটা আর্ট একথা শুনে এসেছে কিন্তু আজ বুঝলো সত্যিই, মনের কথা ভাল ভাবে ব্যক্ত করতে পারা মস্তবড় কৃতিত্ব।

ভদ্রলোক ঐ অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী।

মাত্র কয়েকটি কথা কিন্তু এরই মধ্যে অভিজিতের মনে হচ্ছে যেন কতকালের পরিচয়।

যদি আপনার অসুবিধা না হয় নিশ্চয়ই আসবো।

একটু বিরতির পর অভিজিৎ আবার বলল, আমার বাবাও বিজ্ঞানের সাধক।

আসলে আমি আনন্দিতই হবো অভিজিৎবাবু। আপনার বাবার নাম জানতে পারি ?

মানবেন্দ্র রায়।

উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছেন ভদ্রলোক।

কি বললেন ? আপনি মানবেন্দ্র রায়ের ছেলে ?

অভিজিৎ দেখতে পেলো ভদ্রলোকের মুখের বিকৃত অংশ আলোর সামনে এসে পড়েছে।

অভিজিৎ আবার চমকে উঠলো।

অসহ্যকর দৃশ্য। তাকিয়ে দেখার মত শক্ত নার্ভ নেই অভিজিতের।

ভদ্রলোক বুঝতে পেরেছেন।

আমি দুঃখিত অভিজিৎবাবু।

অন্ধকারের দিকে নিজের মুখের বিকৃত অংশ ফিরিয়ে নিয়েছেন আবার।

এর মধ্যে রোশনারা এসে উপস্থিত হল।

এবার চলি দুলুভাই, সময় পেলেই এদিকে আসবো।

নমস্কার।

উঠে দাঁড়ালো অভিজিৎ।

আসবেন আবার।

দরজার বাইরে থেকে অভিজিতের উদ্দেশ্যেই কথাটা বলল ভদ্রমহিলা।

হাত তুলে ভদ্রমহিলাটির উদ্দেশ্যে নমস্কার করে অভিজিৎ বলল, আজকে আসবার জন্যে অনুরোধ করছেন, একদিন কিন্তু বলতে বাধ্য হবেন, আর মাড়াবেন না এদিক।

সেই দিনটির জন্যে পথ চেয়ে থাকবো।

ভদ্রমহিলার কথার মাঝে বাধা দিল রোশনারা, আজকে আর দেরী করতে পারছি না শ্রীলা। বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলমালের খবর এর মধ্যে নিশ্চয়ই মায়ের কানে পৌঁছে গেছে। বুঝতেই পারছিস মায়ের প্রাণ। তারপর এই শ্রীমানের অবস্থা দেখ। বাসায় নিয়ে গিয়ে শ্রীমানকে তাপ্পি দিয়ে তবে ডেরায় পাঠাতে হবে।

বাইরে গাড়ি অপেক্ষা করছিল।

ওরা দু'জনে নিঃশব্দে গিয়ে গাড়িতে উঠলো।

আচ্ছা, এমন কি প্রয়োজন ছিল রোশনারা? ও বাড়ীতে এই অবস্থায় কি না গেলেই চলতো না?

আমাদের কোন অসুবিধাই হত না অভিজিৎ, কিন্তু আজ আমি না গেলে ওদের সত্যিই চলতো না।

আগাগোড়া আমার যেন সবটাই রহস্যমণ্ডিত বলে মনে হল রোশনারা। ঐ ভদ্রমহিলা, কুৎসিত দর্শন ভদ্রলোক, মুর্শিদকুলী খাঁর আমলের বাড়ী সব কিছুর মধ্যেই রহস্যের ছোঁয়া।

রোশনারা কোন উত্তর দিল না।

অভিজিৎই আবার বলল, বাবার নাম বলতেই ভদ্রলোক কেমন যেন চমকে উঠেছিলেন।

একটা গল্প বলি শোন অভিজিৎ।

রোশনারা উঠে গিয়ে অভিজিতের পাশে বসল।

নিজেকে এক কোণায় ঠেলে নিয়ে গিয়ে অভিজিৎ বলল, গল্পই বলো রোশন, গল্পই ভাল।

বাস্তবকে আর সহ্য করতে পারি না চারিদিক দেখে দেখে।

ম্লান হাসলো রোশনারা অভিজিতের কথায়।

জগন্নাথ কলেজে সেবার আমরা সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি।

আর্টসের ছাত্রী হলেও কি করে যেন খাতির হয়ে গিয়েছিল সায়েন্সের প্রফেসর জে. বি-র সাথে।

জে. বি-র পুরো নাম জয়ন্ত বোস।

আমি, আয়েষা, শ্রীলা আর রঞ্জনা একদিন জে. বি-কে ধরলাম সাভারের অফুরন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিয়ে আনার জন্যে।

সাগরের কাছেই নিশ্চিন্তপুরে জে. বি-র বাড়ী।

সংসারে বুড়ি মা ছাড়া আর কেউই ছিল না জে.বি-র। বিয়ে করবেন না স্থির করেছিলেন।

সামনেই ছিল গ্রীষ্মের ছুটি। রাজী হয়ে গেলেন জে. বি।

কথা হল, দিন তিনেক থেকে সমস্ত সাভার চষে ফেলে তারপর ঢাকায় ফিরবো।

ইট কাঠ লোহা দেখে দেখে চোখ পচে যাবার যোগাড় হয়েছিল।

গ্রীষ্মের ছুটি হলে একদিন সকালবেলা রওনা হয়ে বেলা বারোটা নাগাদ গিয়ে পৌঁছালাম নিশ্চিন্তপুরে।

ছবির মত গ্রাম নিশ্চিন্তপুর।

গ্রাম খালি করে হিন্দুরা সবাই হিন্দুস্থানে চলে যায়নি। শতকরা আশী ভাগ হিন্দু নিশ্চিন্তপুরের মায়া ছাড়তে পারেনি।

সেদিন নিশ্চিন্ত মনে নিশ্চিন্তপুর দেখা সারলাম। সন্ধ্যেবেলায় প্রোগ্রাম হল পরের দিন আমরা সকলে মিলে সাভারে যাবো।

হঠাৎ বেশ জোরেই একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রোশনারা বলল, সাভার আমি আজো দেখিনি, অভিজিৎ। জানি না, কোনদিন দেখবো কিনা। অভিশপ্ত সাভার কোনদিন আমাকে তার কাছে যেতে দেয়নি। যতবার উদ্যোগ করেছি একটা না একটা বাধা এসেছে।

সেকি! তোমাদের পরের দিনের প্রোগ্রাম কি তাহলে বানচাল করে দিলে?

আচ্ছা অভিজিৎ, চোখের সামনে কখনো কোনো মেয়েকে রেপ করতে দেখেছো?

তার আগে একটা প্রশ্নের জবাব দাও তো রোশন?

কি বলো?

আচ্ছা, শরীর ভাল আছে তো তোমার?

রোশনারার শরীরে কোনদিন অসুখ ঘেষতে দেখেছো?

তাইতো সন্দেহ হচ্ছে তোমার কিছু একটা হয়েছে।

আমার প্রশ্নের উত্তর কিন্তু এখনো তুমি দাওনি অভিজিৎ।

তেমন দুর্ভাগ্য হয়নি রোশন।

কিন্তু আমি দেখেছি। এই দুটো চোখ দিয়ে।

রোশন!

হ্যাঁ অভিজিৎ, আর দেখেছিলাম বলেই পরের দিন সাভার দেখা হয়নি।

রোশনারা!

সে এক মর্মান্তিক কাহিনী অভিজিৎ।

সেই রাত্রেই? প্রফেসার জে-বি? ভিকটিম কে?

বাসা আসতে এখনো দেরী আছে অভিজিৎ, উত্তেজিত হলে আমি খেই হারিয়ে ফেলবো।

আচ্ছা আচ্ছা, আমি আর ডিসটার্ব করব না।

সেরাত্রে খেয়েদেয়ে শুয়েছিলাম। তখন রাত এগারোটা নিশ্চয়ই হবে। নিশ্চিন্তপুর তখন পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছে।

কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত।

অপরিচিত জায়গায় ঘুম আসছিল না।

পাশে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমাচ্ছে আয়েষা, শ্রীলা ও রঞ্জনা।

শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছি আর মাঝে মাঝে রেডিয়াম দেওয়া ঘড়ির কাঁটা দেখছি।

বারোটা···একটা···তুটো···বেজেই চলেছে।

পাশাপাশি তিনখানা দালান ঘর।

মাঝের ঘরে আমাদের শোবার ব্যবস্থা করেছিল, একপাশে জে. বি অপর পাশে জে. বি-র বুড়ি মা।

রাত আড়াইটের সময় দেখলাম অন্ধকার বাড়ীটা হঠাৎ আলোয় ভরে গেল। নিঃশব্দে জানালার কাছে উঠে গিয়ে দেখি বড় বড় মশাল হাতে অনেক লোক বাড়ীর চারপাশে ঘুরঘুর করছে।

ভাবলাম, প্রফেসার জে. বি-কে ডাকি, কিন্তু তার আগেই ওরা —ঐ বাইরের লোকগুলো ডাকতে সুরু করেছে।

হেঁড়ে গলায় বাইরে থেকে একজন চীৎকার করে উঠলো, দরজা ভাঙবো না দরজা খুলে দেবে?

ডাকাত?

অভিজিৎ বাধা দিল মাঝখানে।

জে. বি ভেতরের দরজা খুলে আমাদের ঘরে এসেছে।

দরজা আমরা খুলে দেবো কিন্তু কথা দিতে হবে কারো গায়ে হাত দেবে না। সর্বস্ব নিয়ে যাও কিন্তু গায়ে হাত দিতে পারবে না কারো।

রজব মুন্সি কথা দিয়ে ডাকাতি করে না কোথাও। দরজা ভাঙতেও তার মুহূর্ত কয়েকের বেশী সময় লাগে না।

জীবনের কয়েকটা স্মরণীয় মুহূর্ত।

থরথরিয়ে কাঁপছি আমরা।

হাত কামড়াচ্ছে জে. বি।

রজব মুন্সির নামে পূর্ববাংলা থরথরিয়ে কাঁপে। পুলিশ পর্যন্ত ভয়ে কিছু বলে না লোকটাকে। সেই রজব মুন্সি এসেছে মানুষের গন্ধ পেয়ে নিশ্চিতপুরে এসেছে।

জে. বি নিজে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

খোলা দরজার বাইরে জ্বলন্ত মশাল হাতে সেই দেখলাম রজব মুন্সিকে। মিশকালো রং গায়ের। পুরো ছ'ফুট, পাথরের মত শরীর। মুখে চাপ চাপ কালো দাড়ি।

এক হাতে জ্বলন্ত মশাল। অপর হাতে চকচকে রাম-দা নিয়ে ঘরে ঢুকলো আগে রজব মুন্সি ও পরে দলের আরো ছ'সাতজন।

জে. বি ততক্ষণে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

আশ্চর্য সাহস দেখলাম জে. বি-র।

মা, চাবিটা ওকে দিয়ে দাও, সব খুঁটে নিয়ে যাক। শুধু আমার অতিথিদের গায়ে যেন হাত না দেয়।

নীচু হয়ে চাবির গোছা কুড়িয়ে নিল রজব মুন্সি।

তারপর পাঁচটা ভয়াবহ মিনিট—

জে. বি-কে নিরস্ত করে দিতে বেশী সময় নেয়নি রজব মুন্সি।

পরে মশাল উঁচিয়ে এসে দাঁড়ালো আমাদের সামনে।

একে একে মশাল তুলে ধরল চারজনের মুখের ওপর।

হলদে দাঁতগুলো চকচক করে উঠলো নেকড়ে বাঘের দাঁতের মত রজব মুন্সির। চোখ দুটো জ্বলছে রজব মুন্সির। শুকনো ঠোঁট দুটো জিভ দিয়ে বার বার ভিজিয়ে নিচ্ছে সে।

প্রফেসার, তোমার চারটে হীরের মধ্যে মাত্র একটা হীরে আমার চাই তাও মাত্র মিনিট দশেকের জন্যে।

জিভ দিয়ে পুরু ঠোঁট দুটো আবার চাটলো রজব মুন্সি।

রজব মুন্সি?

প্রফেসার জে. বি এগিয়ে গেল রজব মুন্সির সামনে।

হীরে তোমার জীবনে অনেক নিয়েছো রজব মুন্সি। তোমাদেরই অঞ্চলের এক গরীব প্রফেসারের ইজ্জতে আর হাত দিও না। ওরা আমার অতিথি।

তুমি বুঝছো না প্রফেসার, ঐ ছোকরাগুলো দলে এসেছে সে তোমার ঐ হীরেরেই লোভে।

তাই বলছি প্রফেসার একটা মাত্র হীরে চাই।

রজব মুন্সির হাতের মশাল আর একবার আমাদের মুখের ওপর দিয়ে ঘুরে গেল।

রজব মুন্সির পেছনে তখন দশবারো জন লোক এসে দাঁড়িয়েছে।

মশালের আলোয় ছোট ঘরখানা লাল হয়ে উঠেছে।

আমি হাতজোড় করছি রজব মুন্সি।

জে. বি দু'হাত একত্র করে দাঁড়ালো ঐ সমাজবিরোধীর সামনে। দিন আর রাতে কত তফাৎ দেখলাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

ভয় আমি পাইনি অভিজিৎ।

শুধু আক্ষেপ হচ্ছিল রিভলবারটা কেন সঙ্গে নিয়ে যাইনি।

এতোগুলো হীরে ছেড়ে দেবে সর্দার।

পেছন থেকে কে যেন বলে উঠলো।

চোপরও কুত্তা।

হেঁকে উঠলো রজব মুন্সি।

দেখছো তো প্রফেসার, ওরা মানবে না। একটা হীরে তুমিই তুলে দাও। যেমন করে চাবির গোছা এগিয়ে দিয়েছো তেমনি করে হীরে একটা দাও। তোমার কথা থাক, আমার কথাও থাক।

রজব মুন্সি ?

রাত বেশী হচ্ছে প্রফেসার।

হঠাৎ দেখলাম রজব মুন্সির কণ্ঠস্বর ভয়ানক গম্ভীর হয়ে উঠলো। বুঝলাম এবার রক্ষে নেই। একজনকে মরতেই হবে আমাদের মধ্যে। আমি আয়েষা শ্রীলা আর রঞ্জনা।

রজব আলী এগিয়ে এলো আমাদের কাছে।

মশালের আলো তুলে ধরল মুখের ওপর।

হাত বাড়াচ্ছে রজব মুন্সি তার হাতের রাম-দা বগলদাবা করে।

ইসাক তোকে কথা দিয়েছিলাম, এই নে—

হঠাৎ শ্রীলার হাত ধরে হেঁচকা টান দিল।

তৈরী ছিল ইসাক।

ঠিক যেন লুফে নিল শ্রীলাকে।

শ্রীলা মানে এইমাত্র যাঁর বাসা থেকে ঘুরে এলাম ? অভিজিত প্রশ্ন করল।

রজব মুন্সি ?

আর্তনাদ করে উঠলো জে. বি।

কিন্তু ততক্ষণে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় শ্রীলার দেহের সমস্ত আবরণ খুলে ওকে একেবারে উলঙ্গ করে ফেলেছে।

আমি ইসাককে ওয়াদা করেছি প্রফেসার।

আমাদের চোখের সামনে ইসাক ঝাঁপিয়ে পড়ল শ্রীলার দেহের ওপর।

শকুন যেমন ঠুকরে ঠুকরে মড়া খায়, ঠিক তেমনি করে কুরে কুরে খেতে লাগলো শ্রীলাকে।

জে. বি সহ্য করতে পারেনি। হতভাগিনী মেয়েটাকে রক্ষা করার জন্য শেষ চেষ্টায় টেনে তুলতে গেল ইসাককে।

প্রস্তুত হয়ে ছিল রজব মুন্সি।

হাতের জ্বলন্ত মশালটা ঠেসে ধরল জে. বি-র মুখের ওপর।

জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল জে. বি।

ঠুক ঠুক ঠুক ঠুক ঘোড়ার গাড়ি এগিয়ে চলছে।

অভিজিৎ বোবা হয়ে গেছে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে নিজেকে সিটের ওপর ঠেসে ধরেছে রোশনারা।

কিছু সময় পরে রোশনারাই আবার নীরবতা ভঙ্গ করল।

হাসপাতাল থেকে ফিরেই জে. বি শ্রীলাকে বিয়ে করে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের ওপর দুর্ভাগ্য। জে. বি-র কদর্য মুখের দিকে তাকিয়ে ভয় পায় ছেলেরা।

চাকরী গেল জে. বি-র।

আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো রোশনারা।

সেই থেকে ঘরেই থাকে জে. বি।

সংসার ?

অভিজিৎ অনেকক্ষণ পরে মুখ খোলে।

পরের দয়ার ওপর চলে, অভিজিৎ। আমি আয়েষা আর রঞ্জনা —আমরা প্রত্যেকে পালা করে একটা মাসের পুরো দায়িত্ব নিই।

শ্রীলা চাকরী করে না কেন?

লজ্জায় ক্ষোভে ও ঘর থেকে বেরোতে চায় না। দিনরাত জে. বি-কে নিয়েই কাটায়। শ্রীলা নিজেকে শেষ করেছে। জয়ন্ত বোস শ্রীলার জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করেছে। আমরা আশা করেছিলাম দু'জনে নতুনভাবে সব কিছু পাবার চেষ্টা করবে। শ্রীলার কোন ত্রুটি দেখি না। কিন্তু চাকরী যাবার পর জয়ন্ত বোস কেমন যেন হয়ে গেছে। দিনরাত ঘরের মধ্যেই বসে থাকে।

সায়েন্সের প্রফেসার জয়ন্ত বোস তাই বাবার নাম শুনে চমকে উঠেছিল। সত্যিই। অভিজিৎ বলল।

এবার নামবে চলো অভিজিৎ। অধীনের গরীবখানা এসে পড়েছে।

না নামলেই কি চলে না রোশনারা ?

না, চলে না। এই রকম ছেঁড়া পানজাবী নিয়ে তোমাকে বাসায় ফিরতে দেবো না।

গেটের সামনে সুলতান দাঁড়িয়ে।

গাড়িতে বসেই ভাড়া মিটিয়ে দিল রোশনারা। তারপর অন্ধকারের মধ্যেই অভিজিতের একটা হাত ধরে টানতে টানতে বলল, আমরা জে. বি-র ওখানে গিয়েছিলাম একথা যেন কোন রকমেই সুলতান জানতে না পারে।

ওদের গাড়ি থেকে নামতে দেখে সুলতান ছুটে এলো।

সেই সন্ধ্যে থেকে রাস্তা দেখতে দেখতে চোখ প্রায় কানা করে ফেলেছি, তবু তোমার দেখা নেই রোশন।

মৃদু হেসে রোশনারা বলল, আমাকে দেখবার প্রয়োজন হলে ইউনিভারসিটির প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে থাকতে সুলতান। এখানে দাঁড়িয়ে চোখ কানা করতে না।

তৃতীয়দিন দুপুরে অভিজিৎ বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল।

সেদিন রাত্রে ইউনিভারসিটির প্রাঙ্গণে যে আগুন জ্বলেছিল এই দু'দিনে সেই আগুন ঢাকা শহর ছাড়িয়ে আশেপাশে অনেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে।

মানুষের দশ বছরের আক্রোশ হঠাৎ বাঁধ ভাঙায় প্রবল আকার ধারণ করেছে।

এবারের বিক্ষোভ।

প্রথমে জনসাধারণ প্রতিশোধ নিতে গিয়েছিল পুলিশের ওপর। কিন্তু পুলিশ শহর থেকে উধাও হয়ে যাওয়ায় জনতার আক্রোশ গিয়ে পড়েছে আয়ুব সরকারের তল্পিবাহকদের ওপর।

এতদিন যারা ঘুষ খেয়েছে, জালিয়াতি করেছে, অন্যায়ের পক্ষাবলম্বন করেছে, মানুষ তাদের হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ধরতে পারলে কোন চিহ্নই থাকছে না। টুকরো টুকরো হয়ে ধূলোয় মিশে যাচ্ছে।

এক শিকার শেষ করে পরবর্তী শিকারের জন্য ছুটছে মানুষ।

ঢাকা শহরের বাসায় কাকা ও কাকীমা থাকেন।

কাকার ওকালতিতে খ্যাতি আছে।

কাকীমা বাধা দিয়ে বললেন, আজকে না বেরোলেই চলত না ?

নিঃসন্তান ঐ মহিলা পুত্রাধিক স্নেহ করে অভিজিৎকে।

দু'দিন ঘরে বসে গায়ে বাত হয়ে গেছে কাকীমা। একটু ঘুরে আসি। ভয় নেই তোমার। সাবধানেই থাকবো।

ঘরে বসে থাকতে ইচ্ছে না করে লেখাপড়া যখন বন্ধ এই ক'দিন বাড়ী থেকেও তো ঘুরে আসতে পারতিস।

বাড়ী মানে তো সেই মচলন্দপুর। সেই ঘেটুফুল আর পদ্মপাতা ? খুব বেশী হলে বাঁশঝাড়ের ওপারে মাজিরপুরের মাঠ। ও আর ভাল লাগে না কাকীমা।

মা, ভাইবোনেরা ? তারাও কি পর হয়ে গেছে ? তাহলে আপন মানুষ কি কাউকে জুটিয়েছিস নাকি ?

কাকীমা এবার হেসে ফেলে।

হাসতে চেষ্টা করে অভিজিৎও। কিন্তু কেন যেন গলার কাছে এসে হাসি আটকে যায়। মুখ পর্যন্ত এসে পৌঁছয় না।

দুটো দিন অজ্ঞাত এক যন্ত্রণা বুকে নিয়ে কাটিয়েছে।

সামাদ মিঞার জিন্নৎ মহলে যেতে না পারার যন্ত্রণা না প্রোফেসার জে. বি-কে দেখার যন্ত্রণা বুঝে উঠতে পারে না।

আপন-মানুষের কথা বলছিল কাকীমা।

রাস্তায় নেমে অবাক হল অভিজিৎ।

গোটা রাস্তাই এই অপরাহ্ণেই যেন মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে।

দোকানপাট সব বন্ধ।

খুব বেশী প্রয়োজন না থাকলে বাড়ী থেকে বেরোচ্ছে না কেউ।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হলে অবশ্য অভিজিৎও বেরোতো না। কিন্তু

সে সব নয়। এ দাঙ্গা ন্যায়ে অন্যায়ে দাঙ্গা। পাপ পুণ্যের দাঙ্গা। সুতরাং অভিজিতের ভয় নেই।

জনতারাজ বলতে বোঝায় ঢাকা শহরও। আশেপাশে সেই জনতারাজ কায়েম হয়েছে।

পুলিশ কোনকালে দেশে ছিল বলে বোঝবার উপায় নেই।

মিলিটারী রাস্তায় নামতে ভয় পাচ্ছে।

আজ সকালের দিকেই কে যেন বলছিল স্বয়ং গভর্নর সাহেব পর্যন্ত তাঁর ডেরা ছেড়ে মিলিটারী ব্যারাকে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। করাচী থেকে, লাহোর থেকে অতিরিক্ত সৈন্যবাহিনী এসে না পড়া পর্যন্ত সামরিক আইন জারী করতে সাহস পান নি গভর্নর।

জিন্নং মহলের উদ্দেশ্যে হাঁটতে সুরু করল অভিজিৎ।

হয়তো এই গোলমালের মধ্যে ওখানে কাউকে দেখতে পাওয়া যাবে না। অতদূর হেঁটে যাওয়া-আসাই সার হবে।

যদি ওরা আসে, সুলতান হারুন রোশনারা?

ওরা নিশ্চয়ই সন্ধ্যে পর্যন্ত অপেক্ষা করবে অভিজিতের জন্যে।

ঢাকার সবচেয়ে নামকরা ব্যারিষ্টার আফাক চৌধুরীর একমাত্র মেয়ে রোশনারার সঙ্গে আলাপ হওয়া একটা দুর্ঘটনার মধ্যে দিয়েই সম্ভব হয়েছিল অভিজিতের জীবনে। নইলে সাধ্য কি অভিজিৎ রোশনারার মত মেয়ের ধারে কাছে পৌছায়।

রোশনারার সংস্পর্শে সাহিত্যচর্চার বাইরে রাজনীতিতেও জড়িয়ে পড়েছে অভিজিৎ।

গত বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের একাংক নাটক প্রতিযোগিতায় অভিনয় করতে গিয়ে রোশনারা তার শাড়ীতে হঠাৎ আগুন লাগিয়ে ফেললে অভিজিৎই ছুটে গিয়ে সবার আগে উদ্ধার করেছিল রোশনারাকে।

দু'দিন আগেও সেই রোশনারাকে মঞ্চ থেকে তুলে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায় অভিজিৎই।

রোশনারা বন্ধুর মতই ব্যবহার করে তার সাথে।

রোশনারা যখন কোন বিষয় নিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে অভিজিতের সঙ্গে আলোচনায় মত্ত হয়, সুলতান চৌধুরী যেন ফুঁসতে থাকে।

অভিজিৎ জানে রোশনারা সুলতান চৌধুরীর বাগদত্তা।

একদিন ওদের বিয়ে হবে।

সে বিয়েতে নেমন্তন্নও খাবে অভিজিৎ।

হাল্কা মোমের মত মেয়ে রোশনারা চৌধুরী।

কিন্তু ঐ মোমের মধ্যেই বজ্র লুকোনো আছে। স্বভাবে সাহসে বজ্রকঠিন মেয়ে রোশনারা।

হাঁটতে থাকে অভিজিৎ।

জিন্নৎ মহল এখনো অনেক দূরে।

রোশনারা চৌধুরী।

পাকিস্তান ছেড়ে চলে যাবার সমস্ত ব্যবস্থাই করে ফেলেছিলেন বাবা মানবেন্দ্র রায়। এতদিন কলকাতায় প্রতিষ্ঠাও পেতে পারতেন তিনি। কিন্তু পাক-সরকার যেতে দেন নি। পরমাণু বিজ্ঞানে অসাধারণ কৃতিত্বকে পাক-সরকার স্বীকৃতি দিয়েছেন, সম্মান দিয়েছেন। সর্ব প্রকার নিরাপত্তার বিনিময়ে বাবাও রয়ে গেছেন পাকিস্তানে।

কোথায় থাকতো রোশনারা চৌধুরী আর কোথায় যেতো অভিজিৎ রায়।

জিন্নৎ মহলের কেবিনে অভিজিৎ রায়ের জায়গায় রোশনারার মুখোমুখী গিয়ে বসতো কোন রফিকুল ইসলাম অথবা আবুল সরকার।

কিন্তু তা হয়নি।

তবে কি অভিজিৎ রোশনারার প্রেমে পড়ে যাচ্ছে?

রোশনারা মুসলমান তার ওপর সে সুলতানের বাকদত্তা।

সাবধান অভিজিৎ।

নিজেকে সাবধান করতে গিয়ে আপন মনেই হেসে ওঠে অভিজিৎ। দূরে জিন্নৎ মহল দেখা যায়।

কিন্তু তার আগেই চোখে পড়ে ইস্ট এণ্ড মেডিক্যাল স্টোর্সের

ধ্বংসাবশেষ। দোকানটার সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় অভিজিৎ। দোকান বাড়ী কিছুই নেই বললেই চলে। শুধু আগুনে পোড়া কয়েকটা লোহার বরগা একেবেঁকে রয়েছে।

আর একটু এগোলে জিন্নৎ মহল।

দূর থেকেও বোঝা যায় জিন্নৎ মহল ঠিকই আছে। জিন্নৎ মহলের গায়ে কোন হামলা হয়নি।

আদাপ স্যার।

পরিচিত বেয়ারা সেলাম জানায় দরজার সামনে।

আজো খোলা আছে?

না হলে যে আপনারাই আগুন দেবেন?

অতবড় হলে মাত্র দু'জন খদ্দের চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে।

কেবিনের খবর কি?

আপনার জন্যে সকলে অপেক্ষা করছে স্যার।

কাল এসেছিল কেউ?

জী।

পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল অভিজিৎ।

নির্দিষ্ট কেবিনের পর্দা সরিয়ে অভিজিৎ অবাক হল।

একটা সিটও খালি নেই।

হারুন সুলতান রফিক লাইলী এবং রোশনারা। আর রোশনারার পাশে অপরিচিত এক যুবক।

যুবক সুপুরুষ সন্দেহ নেই।

চোখে কালো সানগ্লাস।

পরনে টেরিলিনের সার্ট ও প্যাণ্ট।

এই যে সাহিত্যিক, এসো।

সুলতান নিজের চেয়ারের খানিকটা ছেড়ে দেবার ভঙ্গী করল।

সবার মুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে রোশনারার দিকে চাইলো অভিজিৎ।

কালো চশমার আবরণ ভেদ করে বুঝবার উপায় নেই রোশনারার মুখের ভাষণ।

পাশের কেবিনে কিছুক্ষণ নিরিবিলি বসছি।

কাউকে কোন কথা বলার অবকাশ না দিয়ে পাশের কেবিনে গিয়ে ঢুকে পড়ল।

কি রকম যেন জ্বালা করছে বুকের মধ্যে।

মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে।

রুমালের সাহায্যে ঘাম মুছে ফেলে বেয়ারাকে ডেকে কফির অর্ডার দিয়ে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লো অভিজিৎ।

পাশের কেবিনে ওরা সবাই হাসছে।

হয়ত অভিজিৎকে নিয়েই হাসাহাসি করছে ওরা।

ঘেমে ওঠে অভিজিৎ।

রোশনারার কণ্ঠও শুনতে পাচ্ছে।

এর চেয়ে ভাল হতো মচলন্দপুর ঘুরে এলে।

সামাদ মিঞার ঐ রঙীন পর্দার ফুলের চেয়ে ঘেটুফুল অনেক বেশী তাজা।

অনেকদিন পরে চশমা দেখছে রোশনারার চোখে।

শাড়ীতেও আজ বাহার বেশী।

আস্তে আস্তে অভিজিতের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাচ্ছে হয়ত ওদের কাছে। মিথ্যে বলেছিল রোশনারা। সাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতির যোগাযোগ থাকতে পারে কিন্তু সাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতিজ্ঞের কোন সম্বন্ধ না থাকলেও চলে। নজরুলের কবিতায় রাজনীতির স্পর্শ আছে কিন্তু তাই বলে নজরুল ইনকিলাব জিন্দাবাদ বলে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরেন নি।

কফি নিঃশেষ হয়ে গেল।

দ্বিতীয় কাপের অর্ডার দিল অভিজিৎ।

আবার হাসির ফোয়ারা শোনা যায় ও কেবিন থেকে।

এই কাপ শেষ হলেই বেরিয়ে পড়বে।

বেয়ারা কফির পেয়ালা রেখে গেল।

ঠিক যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল অভিজিৎ কাপের ওপর।

দিনকালও ভাল নয়। সন্ধ্যের আগেই বাসায় ফিরতে হবে। তারপর আস্তে আস্তে নিজেকে সরিয়ে নিতে হবে দল থেকে। পরীক্ষারও বেশী দেরী নেই।

নীল রঙের একটা শাড়ী পরে এসেছে রোশনারা।

অভিজিৎ উঠতে যাবে নীল রঙের শাড়ী পরেই রোশনারা কেবিনের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো।

চোখের কালো সানগ্লাস খুলে হাতে নিয়েছে।

কোথায় যাচ্ছো ?

বাড়ী।

খুব সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল অভিজিৎ।

তোমার সাথে অনেক কথা আছে।

পরে হলেও চলবে নিশ্চয়ই।

এবার যেন বিস্মিত হল রোশনারা।

চলবে। সন্ধ্যের পর বাড়ী থাকবে তুমি।

রোশনারা যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

এর পরে আর বসে থাকা সম্ভব নয়।

কফির দাম চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল অভিজিৎ।

ফার্লংখানেক আসার পর পানের দোকানে পান কিনতে গিয়ে এই প্রথম শুনল প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান নিজে পদত্যাগ করে সেনাবাহিনীর হাতে দেশের শাসনভার ছেড়ে দিয়েছেন।

আজ রাত্রের মধ্যেই সামরিক কর্তৃপক্ষ পূর্ববাংলার শাসনভার গ্রহণ করবে। প্লেন বোঝাই হয়ে অতিরিক্ত সেনাবাহিনী ঢাকা বিমানবন্দরে নামছে। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র এবং সৈন্য বোঝাই যুদ্ধ জাহাজ

নাকি চট্টগ্রাম পোতাশ্রয়ে এসে ভিড়েছে। এর পরের ঘটনা কি ঘটবে চোখ বুঁজে বলে দিতে পারে অভিজিৎ।

বিরোধী নেতারা একযোগে কারারুদ্ধ হবেন!

শাস্তির ভয় দেখিয়ে সাধারণ মানুষের টুঁটি টিপে ধরা হবে।

আপনা আপনিই দেশের প্রতিবাদ থেমে যাবে।

তারপর পরবর্তী কয়েক বছর সামরিক বুটের নিষ্পেষণ।

তাড়াতাড়ি পা চালায় অভিজিৎ।

সৈন্যবাহিনী পথে নেমে পড়লে সদররাস্তা দিয়ে বাড়ী ফেরাই মুশ্‌কিল হয়ে পড়বে।

আর কিছুটা এগোলেই প্রফেসার জে. বি-র বাসা।

একবার ইচ্ছে হল ওদের কাছে খবরটা পৌঁছে দেয়। পরক্ষণেই নিজেকে নিবৃত্ত করল।

ভেতরে একটা বিরাট ওলট-পালট হচ্ছে।

কি করা উচিত, কি করবে কিছুই ঠিক করতে পারছে না।

রাস্তা একেবারেই ফাঁকা।

দু'একজন যাও বা লোকজন চলছিল দেখতে দেখতে তারাও কোথায় উধাও হয়ে গেল!

বিরাট এক অজগর শুয়ে আছে যেন। আর একা অভিজিৎ যেন তার পিঠ বেয়ে এগিয়ে চলেছে। কর্মব্যস্ত নবাবপুর রোড সম্পূর্ণ জনশূণ্য।

বাসায় ফিরতে হলে এইপথ দিয়েই যেতে হবে রোশনারাকে। জিন্নাহ্ মহলের কেবিনে এখনো কি কেউ প্রেসিডেণ্টের পদত্যাগের কথা পৌঁছে দেয়নি?

রোশনারা বলে গেল অনেক কথা আছে তার সাথে। কি এমন কথা থাকতে পারে এই অভিজিতের সঙ্গে! রোশনারার মত সুন্দরী মেয়ের তো কথা বলার লোকের অভাব হবার কথা নয়!

সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় এলো রোশনারা।

পড়ার ঘরে বসে ও 'হেনরীর গল্পের বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল অভিজিৎ।

পড়ায় মন দিতে পারছিল না।

যতবারই বইয়ের পাতায় মনোনিবেশ করার চেষ্টা করছিল ততবারই পাতার অক্ষরগুলো কিলবিল করে উঠছিলো।

এ বাড়ীতে এর আগেও বারকয়েক এসেছে রোশনারা। সোজা অভিজিতের পড়ার ঘরে গিয়ে হাজির হল সে।

রোশনারাকে খুবই উত্তেজিত মনে হল।

কপালের দু'পাশের চুলগুলো অবিন্যস্ত। বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে মুখমণ্ডলে।

অভিজিত!

চেয়ার খালি আছে, আগে বসো। তারপর অনেক কথা হবে।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে রোশনারা গভীর দৃষ্টিতে অভিজিতের দু'চোখের দিকে তাকালো।

যেভাবে তাকাচ্ছো হিন্দুদের মধ্যে একমাত্র শুভদৃষ্টির সময়েই মেয়েরা ঐভাবে তাকায়।

অভিজিৎ স্বাভাবিক হয়ে উঠছে।

পরিহাসের সময় এখন নয় অভিজিৎ, কতকগুলো জরুরী কথা আছে সেরে নিতে চাই। কারণ আর হয়ত সময় পাওয়া যাবে না।

জরুরী কথা বলার জন্যে রোশনারার লোকের অভাব?

অভিজিত!

ধমকে উঠলো রোশনারা। তারপর হেসে ফেলে বলল, কিছু শুনেছো?

হ্যাঁ।

কি শুনেছো?

অভিজিতের সঙ্গে জরুরী কথা আছে রোশনারা খাতুনের।

আর কিছু ?

হাতের ভ্যানিটি ব্যাগটা ধপাস করে টেবিলের ওপর ফেলে দিল রোশনারা।

রোশনারা খাতুন গাড়ী করে এসেছেন। গাড়ীতে সুলতান চৌধুরী শ্রীমতী রোশনারার জন্যে অপেক্ষা করছেন। শ্রীমতী তাই অভিজিতের সঙ্গে প্রয়োজনটুকু যতশীঘ্র সম্ভব মিটিয়ে ফেলে সুলতান চৌধুরীর গাড়ীতে উঠতে চান।

অভিজিৎ রোশনারার মুখের দিকেই চেয়েছিল। হঠাৎ লক্ষ্য করল কেমন এক বোকা বোকা দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকাচ্ছে রোশনারা।

আজ রাত ন'টার সময় শহরের ভার মিলিটারীর হাতে চলে যাচ্ছে। ব্রিগেডিয়ার ওসমান এর মধ্যেই ব্ল্যাক লিস্ট তৈরী করে ফেলেছেন। আর সেই লিস্টের চার নম্বর নাম শ্রীমতী রোশনারা চৌধুরী।

শ্রীমতী রোশনারা কি এই সংবাদে ভীত হয়ে পড়েছেন ?

অভিজিতের হাতের মুঠোয় ও'হেনরীর ছোট গল্পের বইখানা দুমড়ে যেতে থাকে।

একটু আগে ভাসানী সাহেবের বাসায় ফোন করেছিলাম। ভাসানী সাহেব গা ঢাকা দিয়েছেন।

তুই এবং তিন নম্বর ?

তাদেরও কোন সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না।

টেবিল থেকে ভ্যানিটি ব্যাগটা তুলে নিল রোশনারা।

সুতরাং মিলিটারী কর্তাদের দৃষ্টিতে চার নম্বর আসামী শ্রীমতী রোশনারা চৌধুরীরও বেপাত্তা হওয়া প্রয়োজন। আর তাই শ্রীমতী রোশনারা তার ভাবী বর সুলতান চৌধুরীর সঙ্গে পলায়নের পথে অভিজিতের সঙ্গে দেখা করে কিছু কর্তব্যের বোঝা চাপিয়ে দিতে এসেছেন।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো অভিজিৎ—

চলো রোশনারা, গাড়ী পর্যন্ত তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। যদি কোন আদেশ থাকে অধীনের ওপর, গাড়ীতে বসে বসেই হুকুম করতে পারবে। মিলিটারী শাসন এসে একদিক দিয়ে ভালই হল রোশনারা। হানিমুনটা বিয়ের আগেই সেরে রাখতে পারলে।

রোশনারাও উঠে দাঁড়ালো।

তাই চলো অভিজিৎ, গাড়ীতে বসেই প্রয়োজনীয় কথা সেরে নেওয়া যাবে। এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দরজার কাছে থমকে দাঁড়িয়ে বলল, আমি কিন্তু তোমারই কাছে আশ্রয়ের জন্যে এসেছিলাম অভিজিৎ!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অভিজিৎ উত্তর দিল—

আমি কি অবিশ্বাস করেছি শ্রীমতী রোশনারাকে ?

আমি তাহলে চলি অভিজিৎ।

রোশনারা ?

রোশনারা অভিজিতের দিকে আবার সেই অপরিচিত দৃষ্টিতে তাকালো।

ভুল বুঝে যদি চলে যেতে চাও যেতে পার রোশনারা। বাধা দেবার ক্ষমতা আমার নেই।

কিন্তু এর জন্যে একদিন তোমাকে অনুশোচনা করতে হবে।

অভিজিৎ একেবারে কাছে সরে গেল রোশনারার।

কব্জি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো রোশনারা।

ব্যাগ খুলে একতাড়া দশ টাকা আর একশ' টাকার নোট বিস্মিত অভিজিতের হাতের মুঠোয় গুঁজে দিয়ে রোশনারা বলল, আর মাত্র আধ ঘণ্টা সময় হাতে আছে। আমি ঠিক সাড়ে আটটায় আসবো অভিজিৎ। তৈরী হয়ে থাকবে। যদি জাহান্নামে যেতে বলি তবুও। শুধু এইটুকু জেনে রেখো অভিজিৎ, আজ রাত সাড়ে আটটার পর থেকে রোশনারা অনির্দিষ্ট কালের জন্যে তার নিজের

সমস্ত ভার তোমার হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেষ্টা করবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে তুমি তার সম্মান ও জীবন রক্ষা করতে সক্ষম হবে।

ছুটে বেরিয়ে গেল রোশনারা।

বাইরে মোটরের চাপা গর্জন কানে এলো অভিজিতের।

সুটকেসে বেশ কিছুদিনের জামাকাপড় ভরে টাকাগুলো সুটকেসেরই এক গোপন পকেটে স্থানান্তরিত করে অভিজিতের তৈরী হয়ে নিতে সময় লাগলো মাত্র পনেরো মিনিট।

এই গোলমালের মধ্যে এতো রাত্রে কোথাও যাবি নাকি অভিজিৎ।

অভিজিতের গোছগাছ দেখে ব্যস্ত হয়ে কাকীমা ছুটে এলেন।

কিছুদিনের মত গা ঢাকা দিতে যাচ্ছি কাকীমা। সামরিক কর্তাদের শুভদৃষ্টির সম্মুখীন হতে চাইছি না। আজ রাত ন'টা থেকেই সামরিক আইন জারী হচ্ছে।

কাকীমা তার এই ভাসুরপোটিকে যেমন স্নেহ করতেন তেমনি ভয়ও কিছুটা করতেন।

অভিজিতেরও কোন কিছু অজ্ঞাত ছিল না তার কাকীমার কাছে।

দুটো মুখে দিয়ে যাবি তো?

তাই দাও কাকীমা। কথার বদলে সলিড কিছু দাও, পেটে থাকবে কিছুক্ষণ।

সঙ্গে আর কেউ যাচ্ছে?

রোশনারা।

জামার বোতাম আঁটতে আঁটতে উত্তর দিল অভিজিৎ।

দেখো বাপু কোন অঘটন ঘটিয়ে শেষে বংশের নামে কলংক মাখিও না। ভাসুর ঠাকুর এসে যেন অভিযোগ না করেন, আমরা তাঁর ছেলের দেখাশোনা ঠিকমত করতে পারিনি।

কাকীমা খাবার আনতে চলে গেলেন।

অভিজিৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো আটটা পঁচিশ।

ঠিক সাড়ে আটটায় রোশনারা আসবে। সময় যখন বলে গেছে

একচুলও এদিক-ওদিক করবে না মেয়েটা। আশ্চর্য সময়জ্ঞান রোশনারার। ঠিক সাড়ে আটটাতেই ও আসবে।

এদিকে সামরিক প্রভুরা আসছেন রাত ন'টায়।

ঘড়িতে যখন ঠিক সাড়ে আটটা দরজায় শব্দ হল : খুট খুট খুট, খুট খুট খুট।

সুটকেস হাতে নিয়ে বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছিল অভিজিৎ।

হয়ত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মনেমনেই হেসে উঠলো অভিজিৎ, আশ্চর্য সময়জ্ঞান মেয়েটার।

ইংরেজের সময়জ্ঞানের অনেক প্রশংসা অভিজিৎ শুনেছে। রোশনারা একজন কট্টরপন্থী ইংরেজকেও লজ্জা দিতে পারে।

হৃষ্ট মনে দরজা খুলে বাইরের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলো অভিজিৎ।

দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সালংকারা সুন্দরী অপরিচিতা এক নববধূ।

বাল্বের আলোয় সিঁথির সিঁদুর-রেখায় ঘোষিত হচ্ছে আরো একটি মানুষের অস্তিত্ব।

এই সময় নতুন অতিথির আগমনে যেমন বিরক্ত বোধ করল, তেমনি বিস্মিত হল রাত সাড়ে আটটার পরেও রোশনারাকে না দেখে।

রাস্তায় যতদূর দৃষ্টি চলে গাড়ীঘোড়া দূরের কথা, কোন পথচারীরও দেখা নেই।

সামরিক শাসনের কথা শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

অত্যাচারের আশংকায় আতংকিত মানুষ যার যতটুকু মাথা গোঁজবার জায়গা আছে সেখানেই আশ্রয় নিয়েছে।

দেরী করার মত মেয়ে নয় রোশনারা। সঙ্গে সুলতান চৌধুরী থাকতে কোন বিপদের আশংকাও করে না অভিজিৎ। তাহলে দেরী করছে কেন ?

রাত বারোটা বাজার পর হেডকোয়ার্টার থেকে প্রায় নিঃশব্দে রাস্তায় বেরিয়ে এলো একখানা সামরিক জীপ।

জীপের ষ্টীয়ারিং নিজেই ধরেছেন আতাউর রহমান।

পেছনের সিটে দু'জন এবং ডান পাশে একজন মিলিটারী পুলিশ ষ্টেনগান উঁচিয়ে বসে আছে।

আজ দু'দিন হল সামরিক বাহিনী পূর্বপাকিস্তানের ভার নিয়েছে।

গোটা দেশ জুড়ে বিভীষিকার রাজত্ব হয়েছিল।

ক'দিন ধরে যা খুশী করে বেড়িয়েছে মানুষ। খুব কম হলেও তিনশ' লোককে হত্যা করেছে। লুঠ করেছে হাজার তিনেক পরিবারের যথা সর্বস্ব।

আজ মিলিটারীর গন্ধ পেয়ে যে যার গর্তে সেঁধিয়েছে। সব-গুলোকে খুঁজে বের করতে হবে। অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে, মানুষের বিচার করার ক্ষমতা একমাত্র সরকার ছাড়া আর কারো নেই।

গাড়ীর গতি আরো বৃদ্ধি করলেন আতাউর রহমান।

রাস্তায় কোন প্রতিবন্ধক নেই।

বিপরীত দিক থেকে মাঝে মাঝে যখন টহলদার মিলিটারী গাড়ীগুলো আসছে তখনই সামান্য সতর্কতার প্রয়োজন।

গাড়ী পার হয়ে গেলেই আবার সামনের নির্জন রাস্তা।

সাড়ে বারোটায় জীপ এসে থামলো নবাবপুর রোডে ব্যারিস্টার আফাক চৌধুরীর প্রাসাদোপম বাড়ীর সামনে।

দিনের আলোয় এই বাড়ীতে আরো কয়েকবার এসেছেন আতাউর রহমান সাহেব।

পূর্ব বাংলার সবচেয়ে নামকরা ব্যারিস্টার এই আফাক চৌধুরী।

অর্থ সম্মান মর্যাদা কোন কিছুরই অভাই নেই আফাক চৌধুরীর পরিবারের। তবু সেই পরিবারের মেয়ে কেন যে ভবিষ্যৎ জীবনের

নিশ্চিত সুখ-শান্তি পরিত্যাগ করে রাজনীতির মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে ভেবে পান না আতাউর রহমান।

ভাল ছাত্রী হিসাবে রোশনারার প্রশংসায় বিশ্ববিদ্যালয় সোচ্চার। ব্রিগেডিয়ার ওসমানের ভাষায় রোশনারা মীয়ামী বিচের বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগীতায় যোগদানের যোগ্যতার অধিকারী। আফাক চৌধুরীর অর্থের হিসাব সম্ভবত তিনি নিজেও জানেন না। এক কথায় পৃথিবীর সমস্ত সুখ সৌন্দর্য নিজের কব্জায় আনতে পারতো রোশনারা।

সব কিছু বিসর্জন দিয়ে রাজনীতি নিয়ে মেতে উঠেছে। এবার বুঝতে পারবে কতো ধানে কতো চাল। ধরা তাকে পড়তেই হবে। রাজনীতির মজাটা টের পাবে তখন।

গাড়ী থেকে নেমে পড়লেন আতাউর রহমান সাহেব।

ষ্টেনগান হাতে এম. পি. তিনজনও নেমে পড়ল।

গোটা বাড়ীটা অন্ধকারের মধ্যে নিমগ্ন। শুধু আলোর আভাষ পাওয়া যাচ্ছে তিন তলার উত্তর দিকের কোণের ঘর থেকে। হয়ত রাত জেগে কোন মামলার কাগজপত্র তৈরী করছেন আফাক চৌধুরী।

আর আলো জ্বলছে লোহার গেটের কাছে।

আলোর ঠিক সামনেই থাবা বাগিয়ে বসে আছে দুটো এলসেসিয়ান।

আতাউর রহমান গেটের কাছে যেতেই কুকুর দুটো ঘেউ-ঘেউ করে উঠলো।

ভাগ্যিস শিকল দিয়ে বাঁধা নইলে গেট পার হয়েই হয়ত তাঁর টুঁটি চেপে ধরত।

বারান্দায় এক সঙ্গে গোটা তিনেক বাল্ব জ্বলে উঠলো।

আতাউর রহমান এগিয়ে গিয়ে গেটের লোহার রড চেপে ধরলেন।

দরজা খোলার শব্দ হল।

নৈশ পোষাকে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন আফাক চৌধুরী।

কে?

গেটের দরজা একবার খুলতে হবে চৌধুরী সাহেব। মিলিটারী ডিপার্টমেন্ট থেকে আসছি।

এতো রাত্রে! কাল সকালে আসুন।

আফাক চৌধুরীর কণ্ঠে বিরক্তি।

আতাউর রহমান কোনরকম উত্তেজনার প্রকাশ না করে বললেন, ডিপার্টমেন্টের হুকুমে আপনার বাড়ী আজ রাত্রেই সার্চ করা হবে।

চৌধুরী সাহেবের পাশে তার ভৃত্য এসে দাঁড়িয়েছিল, চৌধুরী সাহেব গেটের দরজা খুলে দিতে বললেন।

আতাউর রহমান ফাইল বগলদাবা করে বারান্দায় উঠে গেলেন। সঙ্গে দু'জন এম. পি—ওরা আতাউর রহমানের দু'পাশে দাঁড়িয়ে ষ্টেনগান উঁচু করে ধরল।

বলুন কি দেখতে চান।

আমরা আপনার মেয়ে রোশনারা চৌধুরীর সন্ধানে এসেছি।

আতাউর রহমান সামান্য হাসি মুখের কোণায় এনে বললেন, আপনার মেয়ে রোশনারা চৌধুরীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারের হুকুম আছে। তাকে এনে দিলেই আমরা চলে যাবো, বাড়ী সার্চের কোন প্রয়োজন হবে না।

একটা চাপা ক্রোধের চিহ্ন আফাক চৌধুরীর সমস্ত মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

আফাক চোধুরী নিজেও এই প্রভুদের আগমনের সংবাদ পেয়েছিলেন। আগে থেকেই তিনি জানতেন, যে মুহূর্তে দেশে সামরিক আইন জারী হবে কর্তৃপক্ষ প্রধান প্রধান নেতাদের সাথে রোশনারাকেও গ্রেপ্তারের জন্যে উঠে পড়ে লাগবে।

মনে মনে এজন্যে তিনি নিজেকে প্রস্তুত করে রেখেছিলেন।

রাত একটার সময় আপনারা এসেছেন আমার বাড়ী সার্চ করে বয়স্কা কুমারী মেয়ে রোশনারাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে। আপনারা যে ঠিক ঠিক মিলিটারী ডিপার্টমেন্ট থেকেই আসছেন,

কোন জালিয়াত অথবা বদমায়েস আপনারা নন, এই প্রমাণ চাইবার অধিকার একজন নাগরিক হিসাবে আমার নিশ্চয়ই আছে মিঃ — ?

মিঃ আতাউর রহমান।

ফাইলটাকে বগলদাবা থেকে হাতের মুঠোয় এনে অসমাপ্ত কথার উত্তর দিলেন আতাউর রহমান।

হ্যাঁ, মিঃ আতাউর রহমান। একথা নিশ্চয়ই আপনার অজ্ঞাত নয় যে আজকাল ক্রাইম বহু ভিন্ন ভিন্ন পথে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ?

আমি সেজন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছি মিঃ চৌধুরী।

ফাইল খুলে ডিপার্টমেণ্টের আদেশ এবং নিজের পরিচয়পত্র আতাউর রহমান আফাক চৌধুরীর হাতে তুলে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে একজন এম. পি তার ষ্টেনগানের নল তুলে ধরলেন আফাক চৌধুরীর বুক লক্ষ্য করে।

আপনি একজন সমাজের গণ্যমান্য ভদ্রলোকের বাড়ীতে এসেছেন মিঃ আতাউর রহমান। কোন সমাজ বিরোধী অথবা গুণ্ডা-বদমায়েসের আড্ডাতে নয়।

আফাক চৌধুরীর দু'চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠলো।

মহম্মদ আলী !

ধমকে উঠলেন আতাউর রহমান।

ষ্টেনগানের নল সরিয়ে নিল পানজাবী এম. পি মহম্মদ আলী।

কাগজপত্র আতাউর রহমানের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে আফাক চৌধুরী বললেন, আপনার পরিচয় দেখলাম মিঃ আতাউর রহমান। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে যাকে ধরবার জন্যে আপনি এখানে কষ্ট করে এতো রাত্রে এসেছেন সেই রোশনারা চৌধুরীতো বাড়ীতে নেই। অবশ্য সঙ্গে আপনি সার্চ ওয়ারেন্টও এনেছেন, ইচ্ছে করলে আপনি আপনার কর্তব্য করতে পারেন। আমার লোক আপনাকে সাহায্যই করবে।

মিস রোশনারা চৌধুরী বাড়ীতে নেই ?

কোন ভদ্রলোক নিশ্চয়ই রাত একটার সময় মিথ্যে কথা বলে না মিঃ আতাউর রহমান, যেখানে সে জানতে পারছে তার উক্তি যাচাই হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

আমাকে আমার পথে কাজ করতেই হবে মিঃ চৌধুরী।

অর্থাৎ আপনি সার্চ করবেন এইতো ?

আজ্ঞে।

আফাক চৌধুরী রাইফেলধারী দু'জন এম. পির দিকে তাকালেন, ক্ষণেক কি চিন্তা করলেন দাঁড়িয়ে। তারপর আতাউর রহমানের দিকে তাকিয়ে বললেন, আসুন।

কিন্তু একটা কথা মিঃ রহমান, আমার পরিবারের নিরাপত্তা ?

একজন অফিসার হিসাবে আমি আমার কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন মিঃ চৌধুরী।

ও, আচ্ছা-আচ্ছা।

নৈশ পোষাকের পকেটে হাত ঢুকিয়ে আফাক চৌধুরী বললেন, তাহলে আর রাত করার দরকার কি। আসুন আমার সাথে, কাজ সেরে নেবেন। আমারও একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। জানেন তো মক্কেলের ধকল কি জিনিস।

মিনিট কুড়ি দেখার পর আতাউর রহমান বললেন, এবার মিস চৌধুরীর শয়নকক্ষে নিয়ে চলুন।

নিশ্চয়ই। সবই যখন দেখাতে পারলাম, মায় পাইখানা থেকে বাথরুম পর্যন্ত, তবে আর মিস চৌধুরীর শয়নকক্ষই বা বাদ থাকে কেন ! আসুন।

আফাক চৌধুরীকে অনুসরণ করে রোশনারার শয়নকক্ষে এলেন আতাউর রহমান।

সঙ্গে ষ্টেনগান উঁচিয়ে দু'জন এম. পিও এলো !

আতাউর রহমান একটু বিস্মিত হলেন রোশনারার শয়নকক্ষে এসে।

তিনি কল্পনা করেছিলেন চারিদিকে বিলাস-বাহুল্যের পরিচয় পাবেন। এসে দেখলেন অতি সাধারণ একখানি তক্তপোষ।

বিছানা যা পাতা আছে তাও অতি সাধারণ।

ঘরের এক কোণে ছোট একটা টেবিল আর চেয়ার।

টেবিলে ফুলদানীতে কিছু ফুল রয়েছে আধশুকনো অবস্থায়।

একটা বাংলা ক্যালেণ্ডারও আছে।

ক্যালেণ্ডারে ছবি নেই। শুধু তারিখ।

ড্রেসিং টেবিলের কোন বালাই নেই।

ঘরের আসবাব বলতে আছে দামী একটা আলমারী। আগা-গোড়া মূল্যবান ইস্পাতে মোড়া আলমারির কাছে এগিয়ে যেতেই আফাক চৌধুরী বললেন, একটু অপেক্ষা করুন।

রোশনারা আলমারীর মধ্যে লুকিয়ে আছে কিনা দেখিয়ে দিই।

আফাক চৌধুরীর কথায় দেহের অনেকখানি রক্ত মুখে উঠে এলো আতাউর রহমানের। কিন্তু অতিকষ্টে তিনি নিজেকে সংযত করলেন। হয়ত আফাক চৌধুরী তাঁকে এখন চিনতে পারছেন না। অথবা এমনও হতে পারে এই মুহূর্তে চিনতে অস্বীকার করছেন। কিন্তু ঐ লোকটার কাছে অতীতে একবার নয় দু'-দু'বার উপকৃত তিনি।

অন্য কোন লোক ঐ ধরণের কথাবার্তা বললে এতক্ষণ কি যে হতো চিন্তায়ও আনতে পারেন না আতাউর রহমান।

টেবিলের ড্রয়ার টেনে আলমারীর পাল্লা খুলে ফেললেন আফাক চৌধুরী।

এখানে রোশনারা নেই কিন্তু তার পোষাক রয়েছে।

আমি দেখতে পাচ্ছি মিঃ চৌধুরী।

আতাউর রহমান সাহেব শাড়ীগুলোর কাছে এগিয়ে গেলেন।

সব ক'টা শাড়ীই অত্যন্ত মূল্যবান।

একটা মৃদু অথচ মনোমুগ্ধকর সেন্টের গন্ধ পাচ্ছেন আতাউর রহমান।

ডান দিকের ড্রয়ারটা খুলবো নাকি?

হাসবার চেষ্টা করলেন আফাক চৌধুরী।

কিছু গয়না আছে জানি। কোন প্রেম-পত্রটত্র আছে কিনা জানা নেই। আপনাদের উপস্থিতির সুযোগে মেয়ের কোন প্রেমিক আছে কিনা জেনে নেওয়া যেতে পারে। চাবি অবশ্য রোশনারা রেখেই যায় কিন্তু বাবা হয়ে তো আর মেয়ের ড্রয়ার তার অবর্তমানে সার্চ করতে পারি না। পারি নাকি মিঃ আতাউর রহমান?

আতাউর রহমান এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না।

আপনার নিশ্চয়ই মেয়ে আছে মিঃ রহমান?

আজ্ঞে?

অন্যমনস্ক ছিলেন আতাউর রহমান।

বলছি, আপনার কোন মেয়ে আছে?

আজ্ঞে মেয়ের মা-ই আজ পর্যন্ত হল না, মেয়ে কোথেকে হবে!

আপনি দেখছি ভাগ্যবান লোক মিঃ রহমান। রাত একটার সময় আপনার বাসা সার্চ হবার কোন সম্ভাবনা দেখছি না।

ঘরের চারিদিকে আর একবার সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে টেবিলের কাছে সরে গেলেন আতাউর রহমান।

সুদৃশ্য চৈনিক ফ্লাওয়ার ভাসে একগুচ্ছ শুকনো রজনীগন্ধা।

ফুলের অবস্থা দেখে মনেহয় কমপক্ষে তিনদিন আগের ফুল।

হঠাৎ আতাউর রহমান আফাক চৌধুরীর সামনাসামনি ঘুরে দাঁড়ালেন।

আচ্ছা চৌধুরী সাহেব আপনার বাগানে রজনীগন্ধার ঝাড় আছে?

আছে।

সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন আফাক চৌধুরী।

এবার বিছানার কাছে সরে গেলেন আতাউর রহমান।

নিভাঁজ বিছানা।

কুঁচকে যায়নি কোন কোমল অঙ্গস্পর্শে।

আতাউর রহমান নিশ্চিন্ত হলেন যে রোশনারা খুব কম হলেও দিন দুই বাসায় উপস্থিত নেই।

এবার আমি যেতে পারি মিঃ আতাউর রহমান?

চলুন বাইরের ঘরে। গোটাকয়েক প্রশ্ন করেই আপনার বিরক্তির শেষ করব।

ছাড়বেন না যখন তাই চলুন।

বাইরের মক্কেলের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন সকলে।

আতাউর রহমানের সামনাসামনি একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন আফাক চৌধুরী : বলুন কি আর বাকী আছে মিঃ রহমান।

হাতের ফাইল নাড়াচাড়া করতে করতে আতাউর রহমান বললেন, একথা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন যে আজ হোক কাল হোক আপনার মেয়ের ওপর যখন নজর পড়েছে তাঁকে মিলিটারী ডিপার্টমেন্ট খুঁজে বের করবেই। তিনি যেখানেই অজ্ঞাতবাসে থাকুন না কেন খুঁজে তাঁকে বের করা হবেই। যে জাল বিস্তার করা হয়েছে তা থেকে গলে যাবার সাধ্য কারো হবে না। আইনের কথা নিশ্চয়ই আপনার সামনে বলা অন্তত আমার শোভা পায় না। তবু কর্তব্যের জন্যে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, লুকিয়ে থাকাটাও একটা অপরাধ বিশেষ। সুতরাং আপনারও কিছু কর্তব্য আছে। মেয়ের শাস্তি লাঘব করবার জন্যে আপনার উচিৎ তার সঠিক অবস্থান জানিয়ে দিয়ে ডিপার্টমেন্টকে সাহায্য করা।

দেখুন মিঃ আতাউর রহমান, মেয়ে আমার বড় হয়েছে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন তার গতিবিধির ওপরেও আমার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। সুতরাং আপনার নিরাশ হওয়া ছাড়া আর কোন পথ দেখছি না।

বেশতো মেনে নিলাম মেয়ের বর্তমান গতিবিধির কোন সংবাদ আপনি জানেন না। আর একটা কাজ করতে হবে আপনাকে।

বলুন?

আফাক চৌধুরী চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন।

আপনার আত্মীয়-স্বজনদের একটা লিস্ট কাল সারাদিনের মধ্যে হেড কোয়ার্টারে পাটিয়ে দেবেন।

ভেবে দেখতে হবে মিঃ রহমান, তাই আগামী কালের মধ্যেই সক্ষম হবো কিনা বলতে পারছি না। বুঝতেই তো পারছেন মেয়ে রাজনীতি করে, দল গঠন করে—এই সব খবরের পর আত্মীয়-স্বজনেরা কেউ কোন যোগাযোগ আর রাখতে চায় না।

একটু থেমে আফাক চৌধুরী বললেন, কাল না পারলেও পরশু পর্যন্ত আপনার হেড-কোয়ার্টারে লিস্ট পৌঁছে যাবে।

আজ তাহলে চলি মিঃ চৌধুরী।

ধন্যবাদ।

ধন্যবাদ জানিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন আতাউর রহমান।

রোশনারা চৌধুরী বাসায় নেই।

কাউকেই বাসায় পাওয়া যায়নি। রোশনারা চৌধুরীকেও পাওয়া যাবে না একথা অজানা ছিল না তাঁর। তবু ডিউটি ইজ ডিউটি! কর্তব্যের মধ্যে কোন ফাঁক রাখতে চান না, তাই এখানেও আসতে হল তাঁকে।

রোশনারা চৌধুরী যেখানেই থাক তাঁর হাত থেকে কিছুতেই রক্ষা পাবে না। নিজের ওপর যথেষ্ট আস্থা আছে আতাউর রহমানের। পূর্ববাংলার যেখানেই লুকিয়ে থাক তিনি তাকে খুঁজে বের করবেনই।

ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস বইছে।

চারিদিকের বাড়ীগুলো গাঢ় অন্ধকারে ডুবে আছে।

মৃতের নগরী বলে মনে হচ্ছে ঢাকা শহরকে।

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিরে আকাশ তারায় তারায় ভরে উঠেছে।

রাস্তাও প্রায়ান্ধকার।

হাঙ্গামার সময় হামলাকারীরা নিজেদের সুবিধার জন্যে রাস্তার বাল্বগুলোর অধিকাংশই ভেঙে ফেলেছে।

দূরে দূরে অন্ধকার তাড়াবার জন্যে প্রহরীর মত জ্বলছে দু'একটা বাল্ব। মাঝে মাঝে তীব্র হেড-লাইট জ্বালিয়ে দুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে সৈন্য-বোঝাই মিলিটারী গাড়ী।

মহম্মদ আলী!

জী?

আব কিধার?

যিধার হুকুম করেঙ্গে।

একটা সুন্দর মুখদর্শনে বঞ্চিত হয়ে ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়েছিল মহম্মদ আলী। রোশনারার সৌন্দর্যের খ্যাতির কথা ডিপার্টমেণ্টের আর সকলের মত তারও কানে পৌঁছেছে।

মৌকা মিলেছিল ডিউটিতে আসায়।

বঙ্গালকা লেড়কী দেখা হলো না নসিবে।

এখনই বাসায় নয়। আজ রাত্রেই আরো একটা জায়গায় খবর নেবেন তিনি। সেখানেও পাওয়া যাবে না রোশনারাকে। কিন্তু কোন সূত্র মিলতে পারে।

জীপ ঘুরিয়ে নিয়ে সোজা চালিয়ে দিলেন ইউনিভারসিটির উদ্দেশ্যে।

জিন্নৎ মহল।

সামাদ মিঞাকে চাপ দিলে কিছু খবর বেরিয়ে আসতে পারে।

সামাদ মিঞার জিন্নৎ মহলই ছিল রোশনারার আড্ডাস্থল।

আফাক চৌধুরীর বাসা থেকে ঝড়ের গতিতে জীপ চালিয়ে পনর মিনিটের মধ্যে জিন্নৎ মহলের সামনে এসে পড়লেন আতাউর রহমান।

কোলপসিবল গেট বন্ধ।

অন্ধকারের মধ্যে ডুবে আছে জিন্নৎ মহল।

অবশ্য এখন আলো জ্বালবার কথাও নয়।

গেটের সামনে গাড়ী ভিড়িয়ে দিয়ে জোরে জোরে হর্ণ দিতে দোতলা-তেতলার অনেকগুলো জানালা খুলে গেল।

বোর্ডারদের সংখ্যাও কম নয় জিন্নৎ মহলের।

মিলিটারী গাড়ী দেখে আবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় সবকটা জানালা বন্ধ হয়ে গেল।

আতাউর রহমান গাড়ী থেকে নেমে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলেন।

সামাদ মিঞা!

একজন ভৃত্য চোখ রগড়াতে রগড়াতে দরজার সামনে এলো।

সামাদ মিঞা কোথায়?

তিনিতো এখানে থাকেন না।

তার বাসার ঠিকানা কি?

আমি জানি না, অন্য একজনকে ডেকে দিচ্ছি।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে আর একজনকে ডেকে নিয়ে এলো প্রথম ভৃত্য।

সাতচল্লিশ নম্বর আবুল সরকার লেনে মালিকের বাসা সাব।

আবুল সরকার লেন?

জী।

এখান থেকে কতদূরে?

জী রূপালী সিনেমাহলের কাছাকাছি।

জিন্নৎ মহল থেকে আবুল সরকার লেন।

সাতচল্লিশ নম্বর দোতলা ছোট্ট একটা বাড়ী।

ডাকাডাকি করতে রোখের মাথায় বেরিয়ে এসে সামনে ষ্টেনগান হাতে মিলিটারী দেখে হতমত খেয়ে গেল সামাদ মিঞা।

আতাউর রহমান এগিয়ে গেলেন। সঙ্গে ষ্টেনগান হাতে মহম্মদ আলীও।

দরজা খুলুন সামাদ মিঞা।

হুজুর আমার অপরাধ?

হাত কচলাতে থাকে সামাদ মিঞা।

আপনার জিন্নৎ মহল, আমরা রিপোর্ট পেয়েছি, একটা রাজনৈতিক আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে।

দরজা খুলে দিল সামাদ মিঞা।

দেখুন হুজুর, রেস্তোঁরা খুলেছি লোককে খাওয়াবার জন্যে আর

নিজের পরিবার চালাতে। খদ্দের আসে, পয়সা দেয়, খেয়ে যায়। কারো গায়ে লেখা থাকে না চোর সাধু অথবা শয়তান। তাছাড়া কি জানেন হুজুর, আমার কারবার বা দরকার পয়সার সাথে। আমি খাবার দিই, খদ্দের পয়সা দেয়। খদ্দেরের সাথে এই আমার সম্পর্ক।

কিন্তু আমি সংবাদ পেয়েছি বিশেষ কয়েকজন চিহ্নিত ছেলে ও মেয়ে প্রত্যেকদিন আপনার হোটেলের এক বিশেষ কেবিনে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা মারে।

ইউনিভারসিটির সামনে আমার রেস্তোঁরা হুজুর। খদ্দেরদের মধ্যেও বারো আনাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমার অবস্থা একবার চিন্তা করে দেখুন হুজুর। বসতে মানা করে কি আগুন লাগাবো রেস্তোঁরায় ?

তাহলে আপনি বলছেন কিছুই জানেন না ?

খদ্দেরদের অনেককে চিনি হুজুর কিন্তু রাজনীতির ধার আমি ধারি না।

হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অভিজিৎ শুধাল, কাকে চান ?

অভিজিৎ রায়।

অপরিচিতা এক বিবাহিতা মহিলার মুখে নিজের নামের স্পষ্ট উচ্চারণ শুনে বাধ্য হয়েই মহিলার মুখের দিকে আর একবার তাকালো।

আমি কি বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকবো ?

রোশনারা, তুমি !

চুপ।

দু'ঠোঁটের ওপর তর্জনী চাপা দিয়ে অভিজিতের পাশ কাটিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল রোশনারা।

আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না আমার সামনে পূর্ব বাংলার সবচেয়ে নামী মহিলা শ্রীমতী রোশনারা চৌধুরী দাঁড়িয়ে আছেন !

অভিজিতের বিস্মিত দৃষ্টি তখনো ঘোরাফেরা করছে রোশনারার দেহ চেয়ে।

রোশনারার চুলের বাঁ পাশের সিঁথি মাথার মাঝামাঝি চলে এসেছে।

তুষার শুভ্র সিঁথির রেখায় পড়েছে সিঁদুর-চিহ্ন।

বাঙালী হিন্দু বধুর এয়োতির লক্ষণ।

গলায় বেশ মোটা ধরণের বিছেহার।

পরণে বেনারসী শাড়ী। গায়ে শাড়ীর রঙে ম্যাচ করা ব্লাউজ।

কাকীমা কোথায়?

রান্নাঘরে।

তুমি যেভাবে আমাকে গিলছো, আমার কিন্তু সত্যিই ভয় লাগছে অভিজিৎ।

চোখ দিয়ে গেলাকে বুঝি তোমার বড় ভয়?

মাথার ঘোমটা তুলে দেবো?

ঐটুকুই বা বাকী থাকে কেন!

মাথায় ঘোমটা দিয়ে রোশনারা অভিজিতের একেবারে কাছে সরে গেল।

এবার চোখ ভরে দেখে নিয়ে বলতো কেমন মানিয়েছে?

তোমাকে আমার বৌ-বৌ ভাবতে ইচ্ছে করছে রোশনারা।

এই ফাজিল, বিয়ে না করতেই বৌয়ের সখ!

হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রোশনারা বলল, আর দেরী করা যাবে না অভিজিৎ। আটটা পঁয়ত্রিশ বেজে গেল।

হাতের কাছেই স্যুটকেস ছিল। তুলে নিয়ে অভিজিৎ বলল, আমি কিন্তু এখনো জানতে পারিনি কোথায় কতদূরে যেতে হবে।

জাহান্নাম পর্যন্ত যাবার প্রতিশ্রুতির কথা তুলছো কেন?

আচ্ছা, তাই চল। তোমার মত সুন্দরী মেয়েকে সঙ্গিনী করে জাহান্নাম দূরের করে তার চেয়েও যদি আকর্ষণীয় কোন স্থান থাকে আমি যেতে রাজী।

কাকীমা জানতে পারেননি তো?

তুমি আমার ওপরে ভরসা করেছো রোশনারা।

রাস্তায় নেমে দ্রুতপদে চলতে স্থুরু করল রোশনারা।

স্থটকেস হাতে রোশনারাকে অনুসরণ করে চলল অভিজিৎ।

রাস্তা একেবারে নির্জন।

দ্রুত পায়ে হেঁটে বাঁদিকে প্রথম গলিতে ঢুকে পড়ল রোশনারা।

সামনেই একটা কালো রঙের গাড়ী পার্ক করা আছে।

তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো অভিজিৎ।

ওরা গাড়ীতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী ছেড়ে দিল।

ড্রাইভার তৈরী হয়েই ছিল।

শোন অভিজিৎ, গাড়ী করে আমরা সোজা শীতলক্ষার ঘাট পর্যন্ত যাবো। সেখানে আমাদের জন্যে নৌকা অপেক্ষা করবে।

হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, আটটা চল্লিশ হয়ে গেল স্থলতান।

ন'টার অনেক আগেই আমি তোমাদের নৌকায় তুলে দেবো রোশনারা।

স্পীডোমিটারে আরো জোরে চাপ দিল স্থলতান চৌধুরী।

এতোক্ষণ মাথায় টুপিওয়ালা লোকটা যাকে ড্রাইভার বলে ভুল করেছিল সে স্থলতান চৌধুরী জানতে পেরে এবারে অবাক হল অভিজিৎ।

বারবার ধোঁকা খাচ্ছে তার দৃষ্টি।

পেছনের সিটে হেলান দিয়ে অভিজিৎ বলল, নৌকা পর্যন্ত যাবার কথা শুনলাম রোশনারা। কিন্তু আমাদের তার পরের গন্তব্যস্থল?

হিস্‌স্‌।

আবার ছু'ঠোঁটের ওপর আঙ্গুলের চাপ দিল রোশনারা।

অভিজিৎ বুঝতে পারলো তার নির্ধারিত গন্তব্যস্থলের সবটুকু সংবাদ সে স্থলতান চৌধুরীকেও দিতে চায় না।

রোশনারা তার ভাবী বর সুলতান চৌধুরীকেও অবিশ্বাস করে !

তাকে বিশ্বাস করতে পারবে তো ?

গাড়ী উল্কাগতিতে ছুটে চলেছে।

রোশনারা পথের দিকে তাকিয়ে রয়েছে গভীর মনোযোগ-সহকারে।

হয়ত সামনের বিপদের কথা চিন্তা করছে রোশনারা।

বিপদ অভিজিতের জীবনেও আসতে পারে। আর কোন দোষ খুঁজে না পেলেও রোশনারাকে সঙ্গ দানের, তাকে গার্ড দিয়ে নিয়ে যাবার অপরাধেও চরম শাস্তি আসতে পারে।

অবশ্য শাস্তির জন্যে ভয় পায় না অভিজিৎ।

জীবন থেকে আর কিছু না পারুক ভয়কে সে তাড়াতে পেরেছে।

কিন্তু কেন সে এই ঝুঁকি নিতে চলেছে ? রোশনারা চৌধুরী তার কে ?

মনের মধ্যে হাতড়েও এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায় না অভিজিৎ।

আর কিছু দিনের মধ্যেই ঐ সুলতান চৌধুরীর সংসারে গিয়ে উঠবে রোশনারা।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির নেশা আপনা থেকেই কেটে যাবে সংসারের ও মাতৃত্বের স্বাদ যখন জীবনে আসবে।

ন'টা বাজার ঠিক দশ মিনিট আগে শীতলক্ষার ঘাটে পৌছে দিল সুলতান।

তোমরা গাড়ীতেই অপেক্ষা করো রোশনারা। আমি নেমে দেখে আসি নৌকা ঠিক আছে কিনা।

নৌকা দেখতে চলে গেল সুলতান চৌধুরী।

রোশনারার মুখে কথা নেই।

অভিজিৎ শীতলক্ষার দিকে তাকালো।

শীতলক্ষার বুক বেয়ে আসা শীতল বাতাসে জুড়িয়ে যাচ্ছে শরীর।

বেশ কিছু সংখ্যক নৌকা নোঙর করা আছে ঘাটের আশেপাশে।

ছইয়ের নীচে লণ্ঠন ঝুলিয়ে কিছু নৌকা যাতায়াত করছে শীতলক্ষার বুকের ওপর দিয়ে।

স্থলতান ফিরে আসতে আরো পাঁচ মিনিট কেটে গেল।

সামরিক আইন জারী হতে আর বাকী আছে মাত্র পাঁচ মিনিট।

দশ বছর আগে প্রবল প্রতাপ আয়ুব খাঁও মানুষের মনে এমনি শংকা তুলে শাসন ক্ষমতায় এসেছিল।

সেদিন দেশের মানুষ ভেবেছিল ঐ শক্তিশালী আয়ুব খাঁকে প্রেসিডেণ্টের গদি থেকে সরাতে পারে এমন মানুষ পাকিস্তানে কোন দিন জন্মাবে বলে মনে হয় না। অমন যে ডাক সাইটে প্রেসিডেণ্ট তারো গদি টলমল করে উঠেছিল কিছুদিন যেতে না যেতে।

পুরো দশ বছরের মধ্যেই গদি ছেড়ে প্রাণ বাঁচালো প্রেসিডেণ্ট।

এবার আসছেন ইয়াহিয়া খাঁ।

পাক ভারত লড়াইয়ে ছাম্ব সেকটারে এই সমরনায়ক ইয়াহিয়া খাঁই একমাত্র সফল সেনাপতি যাকে রুখবার মত ক্ষমতা ভারতীয় বাহিনীর যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত হয়নি। সেই যুদ্ধক্ষেত্রের সফল নেতা ইয়াহিয়া খাঁ আসছেন রাজনৈতিক নেতা হিসাবে।

সামরিক শাসনের মাঝে সমগ্র পাকিস্তান আতংকিত।

প্রাণ বাঁচাবার জন্যে নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি দিচ্ছে বিরোধী নেতারা।

স্থলতান উঠে আসছে।

তর্জনী তুলে একটা নৌকা দেখিয়ে দিয়ে স্থলতান বলল, আমি এখান থেকেই ফিরবো। সোজা ঐ নৌকায় চলে যাও।

অভিজিৎ আর রোশনারা দু'জনেই এগিয়ে যাচ্ছিল।

অভিজিৎ?

ওরা অনেকটা নেমে এসেছে।

হঠাৎ পেছন থেকে ডাক দিল স্থলতান।

স্থলতানের চাপা কণ্ঠ যেন হিসহিসিয়ে উঠলো অভিজিতের কানে।

দু'জনেই থেমে গেল।

অভিজিতের মত রোশনারাও বিস্মিত হল।

তুমি এগিয়ে যাও রোশনারা, আমি শুনে আসি ও কি বলে।

খানিকটা ইতঃস্তত করে রোশনারা বলল, আচ্ছা তাই যাও, কিন্তু দেরী করো না।

শোন।

ওপরে ওঠার জন্যে পা বাড়িয়ে দিল। আবার থেমে গেল অভিজিৎ।

বুকের ভেতরে হাত দিয়ে রুমালে প্যাঁচানো কি একটা জিনিস বের করল রোশনারা। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে সতর্কভাবে অভিজিতের হাতে তুলে দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, এটা কাছে রেখে দাও অভিজিৎ। লোড করা আছে। বিপদে কাজে লাগবে।

বিস্মিত অভিজিৎ একবার রোশনারার মুখের দিকে আর একবার সুলতান চৌধুরীর কায়ার দিকে তাকালো।

অন্ধকারে রোশনারার মুখের কিছুই দেখতে পেল না।

তোমার সহৃদয়তার কথা চিরকাল মনে থাকবে রোশনারা।

রুমাল শুদ্ধ ওটা পকেটে চালান করে ওপরে উঠে গেল।

সুলতান চৌধুরী কাঠের ওপরেই অপেক্ষা করছিল।

এই যে অভিজিৎ, দুটো কথা তোমাকে বলে দিতে চাই।

কোমরে দু'হাত দিয়ে ভঙ্গী করে দাঁড়ালো অভিজিৎ।

প্রথম কথা হচ্ছে, রোশনারার সাথে কিছুদিনের মধ্যেই আমার বিয়ে হবে। একথা নিশ্চয়ই তোমার অজানা নয়?

রোশনারা নিজেই একথা বলেছে সুলতান।

অভিজিৎ প্যান্টের পকেটে হাত দিল।

আর তোমার দ্বিতীয় কথা?

রোশনারা আমারই স্ত্রী হবে, এ কথাটা মনে রাখলে আমি উপকৃত ও আনন্দিত হবো।

আর কোন কথা আছে ?

দাঁতে দাঁত চেপে ধরে অভিজিৎ।

সুলতানের ইঙ্গিত বুঝতে তার একটুও অসুবিধা হয়নি।

অন্য সময় হলে একবার দেখে নিতো ঐ সুলতান চৌধুরীকে। কিন্তু এখন সময় নেই। রোশনারার জীবন বিপন্ন।

আচ্ছা, আবার দেখা হবে সুলতান চৌধুরী।

সেই দিনটির অপেক্ষা করব অভিজিৎ।

পেছনের দিকে না তাকিয়েই সিঁড়ি ভেঙে নেমে চলল অভিজিৎ।

একি ! তুমি এখনো নৌকোয় ওঠোনি ?

রোশনারা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

তোমার অপেক্ষায় আছি।

কোথায় কোন মিলে ভো পড়ল।

হাত-ঘড়ির দিকে উভয়েই তাকালো। রোশনারা আর অভিজিৎ।

ঠিক ন'টা।

নৌকা শীতলক্ষা মাঝামাঝি চলে এসেছে।

ঢাকা শহর ক্রমশই দূরে সরে যাচ্ছে।

আলোগুলো ছোট হতে হতে তারার মত হয়ে আসছে।

নৌকা ভীষণভাবে দুলছিল।

পাটাতনে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল রোশনারা আর অভিজিৎ।

নৌকা কোথায় যাবে বলে দিলে না ?

ওকে আগে থেকেই সব বলা আছে অভিজিৎ।

আমার কি জানবার অধিকার নেই ?

নিশ্চয়ই আছে।

হেসে ফেলল রোশনারা।

তুমি এখুনি জানবে কিন্তু তার আগে তোমাকে বলতে হবে কি বলছিল সুলতান তোমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ?

নদীর বুকে অন্ধকার অনেক পাতলা।

একেবারে সোজাসুজি চোখের দিকে তাকালো অভিজিৎ।

তবু স্পষ্ট বোঝা যায় না।

অভিজিৎ কোন উত্তর দিল না।

কই বললে না কি বলছিল সুলতান চৌধুরী!

কি বলবে ভেবে পায় না অভিজিৎ। সুলতান তাকে শাসিয়েছে একথা কোন প্রকারেই বলতে পারবে না রোশনারার কাছে।

কথা বলছ না কেন?

অভিজিৎ তবু নির্বাক।

আমি যদিও অনুমান করছি কি বলতে পারে সুলতান, তবু তোমার নিজের মুখ থেকে শুনতে চাই।

ও বলছিল, যদি কোন বিপদ আসে সুলতানকে যেন খবর দিতে না ভুলি।

প্রসঙ্গ পাল্টাতে চায় অভিজিৎ।

মিথ্যে কথা অভিজিৎ, সুলতানকে আমি অনেকদিন থেকে চিনি। যাক, ছইয়ের ভেতরে চলো। এখানে জলপুলিশ ঘোরা-ফেরা করে। হ্যাঁ আর দেখ তো গাড়ী থেকে আসার সময় আমার স্যুটকেসটা নিয়ে এসেছে কিনা।

তোমার স্যুটকেস ঠিকই আছে রোশনারা। নৌকার দিকে আসার সময় ওর হাতে দেখেছি।

বাইরে দাঁড়ানো কোন দিক দিয়েই নিরাপদ নয় জেনে ছু'জনেই ছইয়ের ভেতরে গেল।

একটা লণ্ঠন ঝুলছে ছইয়ের নীচে।

কালি জমেছে কাচের গায়ে।

ছোট নৌকা, ছু'জন মাত্র মাঝি।

হয়ত বাপ-বেটা।

একজনের বয়স খুব বেশী হলে সতেরো-আঠারো। দ্বিতীয় মাঝি সবে পঞ্চাশ পেরিয়েছে।

অভিজিতের বাড়ী যেতে হলে এই নদী পথই প্রশস্ত।

বহুবারের চেনা পথ।

এই শীতলক্ষাই মচলন্দপুরের পাশ দিয়ে গিয়েছে।

ঢাকা থেকে তিরিশ মাইল পথ, নদী-পথে ছ'ঘণ্টার মত লাগে।

ডিস্ট্রীক্টবোর্ডের রাস্তা ওরা সাধারণত এ ভয়ও করে থাকে।

ঝকঝকে কাঠের পাটাতন। কোন কিছু না পেতেই দু'জনে বসে পড়ল।

আমি কিন্তু এখনো জানতে পারিনি রোশনারা, আমরা কোথায় চলেছি।

তুমি দেখছি ভরাডুবি করে ছাড়বে অভিজিৎ।

কি রকম?

অভিজিৎ প্রশ্ন না করে পারে না।

বুঝতে পারছো না রোশনারা এ পোশাকে অচল?

লজ্জায় পড়ে যায় অভিজিৎ।

মাথায় টকটকে সিঁদুর, পরনে বেনারসী অথচ নাম রোশনারা।

নিজের ওপর আস্থা হারাতে চায় অভিজিৎ।

ভবিষ্যতে কিন্তু এ রকম ভুল আর করবে না।

কি বলে ডাকবো, একটা নাম তুমিই ঠিক করে দাও।

খানিক আগে বৌ বলেছিলে না? বৌ বলে ডাকতে পারবে না?

রোশনারা হাসতে থাকে।

অভিজিৎও সেই হাসিতে যোগ দেয়।

সত্যিই একটা নাম, আচ্ছা, সমর্পিতা বললে কেমন হয়?

অভিজিৎ তাকায় রোশনারার দিকে।

সমর্পিতা! বেশ নাম বের করেছো তো। বেশ, আজ থেকে রোশনারা সমর্পিতাই হল।

এবার আর উপেক্ষা কোরো না। বলো সমর্পিতা, আমরা কোথায় চলেছি?

এই তো লক্ষ্মী ছেলে, তা পেটের ভাত বুঝি হজম হচ্ছে না?

ভাত খেলে তো হজম হবে! কাকীমা জোর করে খানকয়েক পরটা কোন রকমে তার মুখ-গহ্বরে ঠেসে দিয়েছিলেন।

আমরা মচলন্দপুরে যাচ্ছি অভিজিৎ।

মচলন্দপুর! আমাদের গ্রামে?

অভিজিতের বিস্ময়-সীমা ছাড়িয়ে যায়।

মচলন্দপুরে কাদের বাড়ী?

প্রশ্ন না করে পারে না অভিজিৎ।

বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা তা জানো তো অভিজিৎ। অনেক চিন্তা করে দেখলাম নিরাপদ আশ্রয় যদি কোথাও নিতে হয় বাঘের বাসাই উপযুক্ত স্থান। সেখানে দ্বিতীয় কোন বাঘ সন্ধান করতে যাবে না।

তেমন বাঘ তুমি মচলন্দপুরের মত গ্রামে কোথায় পেলে?

মচলন্দপুরে একটি মাত্র বাঘই আছে জানতাম অভিজিৎ।

অভিজিৎ চিন্তিত হয়ে রোশনারার মুখের দিকে তাকায়।

সেই বাঘের নাম মানবেন্দ্র রায়।

রোশনারা এবার সোজাসুজি অভিজিতের চোখের দিকে তাকায়।

তুমি পরিহাস করছো রোশনারা?

আমার বর্তমান সাজ-পোশাকের দিকে তাকিয়ে তোমার কি মনে হচ্ছে আমি পরিহাস করছি?

কালিপড়া লণ্ঠনের আলোয় অভিজিৎ রোশনারার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে।

আমাকে আগে বলতে পারতে রোশনারা। আচ্ছা, তোমাকে নিয়ে এতো রাত্রে বাড়ী গিয়ে কি পরিচয় দেবো বলতে পারো?

তুমি ভয় পেয়ে যাবে আমি ভাবতে পারিনি অভিজিৎ। আমি মাঝিকে নৌকার মুখ ঘোরাতে বলে দিচ্ছি।

থাক আর ওস্তাদি করতে হবে না। কিন্তু বাড়ীতে গিয়ে একটা

কিছু পরিচয় দিতে হবে তো ? কি বলব বলো।

তোমার ওপর আমার ভরসা আছে বলেই আগে থেকে বলার প্রয়োজন বোধ করিনি অভিজিৎ। তুমিই এই প্রথম জানলে আমরা কোথায় চলেছি। এমন কি নৌকার মাঝি পর্যন্ত জানে না আমরা কোথায় যাবো। উজান বেয়ে যাবার কথাই ওকে শুধু বলা হয়েছে।

আমার ঐ একমাত্র চিন্তা কি পরিচয় দেবো তোমার। এতো রাত্রে তোমার মত সুন্দরী মেয়ে সাথে নিয়ে হাজির হলে হাউমাউ করে উঠবেন মা।

কি বলবে তাও আমি ভেবে রেখেছি অভিজিৎ।

মৃদু হাসি দেখা দেয় রোশনারার মুখে।

কি ?

প্রশ্ন করে অভিজিৎ।

মাকে বলবে বিয়ে করে বৌ নিয়ে এলাম।

সমর্পিতা !

এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই অভিজিৎ। আমি সমস্ত দিক ভেবে দেখেছি। নিরাপদে থাকার জন্যে অন্য কোন পথ নেই।

কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করল রোশনারা।

হয়ত একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো অভিজিতকে গোপন করে।

ধরা পড়ার জন্যে আমি ভীত নই অভিজিৎ। তাহলে রাজনীতি করতে নামতাম না। তবে কি জানো, এ সময় ধরা পড়লে ছেলেদের মনোবল ভেঙে পড়বে। অতি কষ্টে যে সংগঠন গড়ে তুলেছি অকালে তার অপমৃত্যু হবে অভিজিৎ। সব কিছু ভেবেই নিজেকে বাঁচাতে চাইছি।

সব বুঝলাম, সমর্পিতা। তোমার কথামত মাকে গিয়ে বলব বন্ধুর বিয়েতে বরযাত্রী গিয়েছিলাম। পণ নিয়ে দর কষাকষিতে বিয়ে ভেঙে যায়। মেয়ের ভায়েরা তখন হাতজোড় করে আমাকে দায় উদ্ধার করতে অনুরোধ করে। আমিও ভাল মানুষের ছেলের মত

বিয়ে করতে রাজী হয়ে যাই। সব বুঝলাম। মনে করো মা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন তোমাকে আমার স্ত্রী বলে মেনে নিলেন। তারপরের পরিস্থিতির কথা চিন্তা করেছো?

আমি সমস্ত দিক দিয়ে চিন্তা করেছি অভিজিৎ। তবে কি জানো, সব কিছুই নির্ভর করবে তোমার ওপর। তোমার সংযম, তোমার শুভেচ্ছা আমাদের এই বিপদের সাগর পার করে নিয়ে যাবে।

অন্য কোন পথ আপাতত নেই। দেশের যেখানেই যাই গুপ্তচর বিভাগের শ্যান চক্ষু আমাকে খুঁজে বের করবেই। মানবেন্দ্র রায়কে আজ পাক সরকারের প্রয়োজন আছে। এই প্রয়োজন যতদিন থাকবে মানবেন্দ্র রায়কে সরকার ঘাঁটাবে না। কারণ ঐ একটি মাত্র লোকের ওপর পাকিস্তানের আণবিক শক্তির অনেকখানি নির্ভর করছে।

অভিজিৎ আর কোন প্রতিবাদ করে না।

রোশনারাও কথা বলে না।

নীরবতা নেমে আসে ছোট্ট পানসীতে।

ছলাৎছল ছলাৎছল শব্দে জল কেটে চলে তাদের ছোট নৌকা শীতলক্ষার শান্ত বুকে বেয়ে।

একটা নৌকা খুব কাছে এসে পড়েছিল।

মাথার ঘোমটা মুখের ওপর টেনে দিল রোশনারা।

প্রায় দশটা বাজতে চললো।

এতক্ষণে সামরিক আইন জারী হয়ে গেছে।

অনেক দূরে নদীবক্ষে একটা লণ্ঠনের আলো কোন নৌকার ছইয়ের নীচে দুলছে। অভিজিৎ ঐ আলোর দিকে তাকিয়ে থাকে।

রাত তিনটের কাছাকাছি মচলন্দপুরে পৌছবার কথা।

নদীর ঘাট থেকে বাড়ী যেতে আরো মিনিট পনেরো লাগবে।

অভিজিৎ জানে অতো রাত্রে রাস্তায় কেউ উপস্থিত থাকবে না।

তারপরেই বাড়ী।

সেখান থেকে ওর হবে আসল সমস্যা।

ওর সাড়া পেয়ে সবার আগে মা ছুটে আসবেন। দরজা খুলে দিয়ে একমাত্র ছেলেকে খুঁজতে গিয়ে চোখে পড়বে রোশনারাকে।

আর ভাবতে পারে না অভিজিৎ।

যা হবার হবে।

দূরের নৌকার আলোটা একটু একটু করে এগিয়ে আসছে।

সমস্ত আশংকার ওপরে একটা সুখানুভূতি অভিজিৎকে আনন্দ দিচ্ছে সেটা হল রোশনারার উপস্থিতি এবং অভিজিতের প্রতি নির্ভরতা।

আকাশের দিকে তাকিয়ে অভিজিৎ দেখতে পেলো এক টুকরো কালো মেঘ দেখা দিয়েছে উত্তরের আকাশে।

প্রায়ই ঝড় উঠতে দেখা যায় উত্তরে মেঘে।

মাঝিকে ডেকে নদীর কূল ঘেঁষে নৌকা চালাতে বলে দিল।

হাত দুয়েক তফাতে বসে আছে রোশনারা।

রোশনারার গায়ের একটা মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছে অভিজিৎ।

অনেক কুমারী মেয়ের গায়েই এই ধরনের গন্ধ পাওয়া যায়। বিয়ের পরেই এই গন্ধটা হারিয়ে ফেলে মেয়েরা।

এখনো ঘণ্টা পাঁচেক সময় নেবে, তুমি কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেবে?

অভিজিৎ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রোশনারার চোখের দিকে তাকায়।

ঘুম আসবে না অভিজিৎ, তার চেয়ে বসে বসেই বাকী সময়টুকু কাটিয়ে দেওয়া যাক। বরং তুমি ইচ্ছে করলে খানিকটা গড়িয়ে নিতে পারো।

খোকা! খোকা···আ···আ···!

ওকি! অমন করে চীৎকার করছে কে অভিজিৎ?

নদীর পাড়ের দিকে তাকালো রোশনারা।

খোকা···আ···আ···!

আবার সেই বুকফাটা আর্তনাদ।

চীৎকার ক্রমেই এগিয়ে আসছে।

রোশনারার দৃষ্টি অনুসরণ করে অভিজিৎও তাকালো।

একটু পরেই দেখতে পাবে এক ভদ্রমহিলা নদীর কিনারা দিয়ে ছুটছে তার হারিয়ে যাওয়া খোকাকে ডাকতে ডাকতে। আর লণ্ঠন হাতে মহিলাকে অনুসরণ করছে একজন পুরুষ।

ঐ, ঐযে মহিলা ছুটে চলেছে অভিজিৎ। ঠিক তার পেছনেই আছে একজন পুরুষ। পুরুষের একহাতে লণ্ঠন অপর হাতে লাঠি।

যতক্ষণ আকাশে মেঘ থাকবে ততক্ষণ নদীর কিনারে কিনারে একমাত্র ছেলেকে খুঁজে বেড়াবে ঐ মহিলা। তারপর ক্লান্ত দেহে কোথাও অচেতন হয়ে পড়লে ঐ পুরুষ তাকে তুলে নিয়ে যাবে।

অভিজিতের কণ্ঠ যেন ভিজে আসে।

ওরা কে? ওদের খোকাই বা কোথায় গেছে?

রোশনারার কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায়।

সে এক অশ্রুসিক্ত কাহিনী রোশনারা। শুনলে হৃদয় ভারাক্রান্তই হবে।

তা হোক অভিজিৎ, তবু তুমি বলো।

অভিজিৎ আকাশের দিকে তাকালো।

কালো মেঘটা আকাশের অনেকখানি জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

সামনেই সুন্দরপুর গ্রাম।

পাকিস্তান হবার পর সুন্দরপুরের সেই সৌন্দর্য আর নেই রোশনারা। অথচ একদিন সুন্দরপুরের খ্যাতি ছড়িয়েছিল দূর-দূরান্ত পর্যন্ত। স্বয়ংসম্পূর্ণ এই সুন্দরপুরকে দেখবার জন্যে দূর দূর দেশ থেকে দর্শকদের সমাগম হত।

সুন্দরপুরকে সুন্দর করে তোলার সমস্ত কৃতিত্ব একটি মাত্র মানুষের।

সুন্দরপুরের দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার শংকরনারায়ণ।

জমিদার শংকরনারায়ণ সুন্দরপুরকে গড়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু সুন্দরপুরকে মনের মত করে গড়তে গিয়ে ভেঙেছিলেন অনেক সংসার।

সেই ভাঙাগড়ার অনেক স্মৃতি বুকে নিয়ে সুন্দরপুর আজো তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে।

তবে শংকরনারায়ণ আর নেই।

শংকরনারায়ণের নিজের সংসারও ভেঙেছে এই সুন্দরপুরেই।

জমিদার শংকরনারায়ণের প্রতাপে সে সময়ে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেতো। হিন্দু-মুসলমান প্রজারা অত্যাচারের ভয়ে সর্বদাই তটস্থ থাকতো।

লজ্জা বলে কোন জিনিস ছিল না শংকরনারায়ণের মধ্যে, হয়ত তাই ভগবানের কাছেও শংকরনারায়ণের বংশ ক্ষমা পায়নি কোনদিন। শংকরনারায়ণের একমাত্র পুত্রবধূ সেই পাপেই হয়ত আজ নদীর তীরে তীরে হারিয়ে যাওয়া ছেলেকে খুঁজে ফিরছে।

শংকরনারায়ণের ছেলে দীপকনারায়ণ।

পিতার রক্ত তারও দেহে।

অত্যাচার করে বেড়াতো দীপকনারায়ণও, কিন্তু শংকরনারায়ণ অত্যাচার করত মানুষের ওপর আর দীপকনারায়ণ অত্যাচার করে বেড়াতো বনের পশুপক্ষীর ওপর।

মানুষের সঙ্গে কোন বৈরীতা ছিল না দীপকনারায়ণের।

শিকার করে বেড়ানোই ছিল দীপকনারায়ণের একমাত্র নেশা।

শংকরনারায়ণের দিন কাটতো কাছারী ঘরে আর দীপকনারায়ণ থাকতো চরে চরে। একদিন শংকরনারায়ণের মৃত্যু হলে দীপকনারায়ণের ওপর সমস্ত জমিদারীর ভার এসে পড়ে। দীপকনারায়ণ তবু ঘুরে ঘুরে বেড়ায় চরে হাওড়ে।

শংকরনারায়ণের অত্যাচারের প্রতিশোধ অনেকেই নিতে চেয়েছিল পুত্র দীপকনারায়ণের ওপর। কিন্তু অসন্তুষ্ট প্রজাদের কেউ

কোনদিন ক্ষতি করতে সক্ষম হয়নি দীপকনারায়ণের সর্বক্ষণের সঙ্গী দেহরক্ষী হীরা সিংয়ের সদা সতর্কতার ফলে। দুর্ধর্ষ হীরা সিংয়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করে কেউ পৌঁছাতে পারেনি দীপকনারায়ণের কাছে।

উদ্যত বন্দুক হস্তে দীপকনারায়ণকে অনুসরণ করত হীরা সিং।

বিশ্বস্ত পাঞ্জাবী হীরা সিংয়ের লক্ষ্য ছিল অব্যর্থ।

দীপকনারায়ণেরও একই ছেলে।

চন্দন।

আট বছর বয়সে চন্দনকেও পেয়ে বসে এক বিচিত্র নেশায়।

বাবা দীপকনারায়ণ হীরা সিংকে নিয়ে ফেরে রক্তের নেশায়, আর পুত্র চন্দন ঘুরে বেড়ায় জলের সন্ধানে।

যেখানে জল সেখানে চন্দন।

ডাক্তার হার মেনেছে, বৈদ্য মাথায় হাত দিয়েছে। চন্দনের জলের কারণ খুঁজে বের করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

মা স্বর্ণময়ী রাত্রে চন্দনকে বুকের মধ্যে করে ঘুমান। সব সময়ের জন্যে তাঁর ভয়, কখন কোন অঘটন ঘটে বসে।

বাড়ীর পাশেই কাজল দীঘি।

কাজল দীঘির কালো জলের দিকে চাইলেই স্বর্ণময়ীর প্রাণ উড়ে যায়।

স্বামীকে কতদিন বলেছেন মাটি ফেলে বুজিয়ে দেবার জন্যে ঐ কাজল দীঘি।

প্রায়ই তাঁর চোখে পড়ে কি এক গভীর দৃষ্টিতে দোতলার ছাদের ওপর থেকে কাজল দীঘির দিকে তাকিয়ে থাকে চন্দন।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়। ডেকে সাড়া পাওয়া যায় না ছেলের।

একদিন রাত্রে পাশ ফিরতে গিয়ে স্বর্ণময়ী দেখলেন চন্দন বিছানায় নেই।

চমকে উঠলেন স্বর্ণময়ী।

রাত দেড়টা।

হীরা সিং সন্ধ্যেবেলা খবর দিয়ে গেছে দীপকনারায়ণ রাত্রে বাড়ী ফিরবেন না।

লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসলেন স্বর্ণময়ী।

চীৎকার করে উঠলেন।

চন্দন!

কোন সাড়া নেই চন্দনের।

স্বর্ণময়ীর চীৎকারে ঝি-চাকর আত্মীয়-স্বজন ছুটে এলো। এলো না একমাত্র চন্দন।

সবাই চন্দনকে খুঁজতে বেরুলো।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর ছেলেকে পাওয়া গেল কলঘরে।

সাওয়ার থেকে অবিশ্রান্ত ধারায় জল ঝরছে।

জলের সহস্র ধারার নীচে মাথা পেতে দিয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে চন্দন।

ছুটে গিয়ে স্বর্ণময়ী ছেলেকে বুকে তুলে নিলেন।

একমাত্র সন্তান তাঁর।

চন্দন এখনো ঘুমিয়ে।

কোন ফাঁকে উঠে এসে মাথা পেতে দিয়েছে জলের তলায়।

আর একদিনের কথা।

সেদিন বিকেলের দিকে স্বর্ণময়ী খুঁজে পেলেন না চন্দনকে।

বাড়ীর কোথাও ছেলেকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

সন্ধ্যের দিকে একজন খবর আনলো কাজল দীঘির কাজল কালো জলে পা ডুবিয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে চন্দন।

স্বর্ণময়ী জিজ্ঞাসা করেন, কি দেখছিস চন্দন? কি আছে জলে?

বোকার মত মায়ের মুখের দিকে তাকায় চন্দন।

ছেলেকে নিয়ে আর এক বিপদ স্বর্ণময়ীর।

আকাশে মেঘ দেখলে আর নিস্তার নেই। ছেলে যেন ক্ষেপে যায়। ছুটে বেরিয়ে যেতে চায় বাড়ী থেকে।

অসুরের মত শক্তি আসে তখন ঐ আট বছরের ছেলের ছোট্ট দেহে।

স্বর্ণময়ীর পক্ষে সামলানো মুসকিল হয়ে পড়ে ছেলেকে।

আকাশে মেঘ দেখলে একমাত্র তখনই ছেলের কথা মনে হয় দীপকনারায়ণের। যেখানেই থাকুন ঘোড়া ছুটিয়ে দেন বাড়ীর উদ্দেশ্যে।

লোকে বলে অভিশাপ।

অনেক অভিশাপ কুড়িয়েছে শংকরনারায়ণ। এ তারই ফল।

মানুষের অনেক রক্ত ঝরিয়েছে শংকরনারায়ণ।

শংকরনারায়ণের ছিল রক্তের পিপাসা। জলের পিপাসায় ভুগছে বংশের একমাত্র ছেলে চন্দন।

সুন্দরপুরের জমিদার-বাড়ীতে ধীরে ধীরে অশান্তি বাসা বাঁধে।

দীপকনারায়ণের শিকারের মাত্রা ততই বেড়ে যায়।

জল ছাড়া আর কিছুই যেন জানে না ছেলে।

এক চৈত্রের দুপুর।

হাতে উদ্যত বন্দুক নিয়ে দীপকনারায়ণ ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন আড়িয়াল খাঁর শুকনো বুকে।

পেছনে ছায়ার মত অনুসরণ করছে হীরা সিং।

তারো হাতে উদ্যত বন্দুক।

হঠাৎ সজোরে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলেন দীপকনারায়ণ।

থেমে পড়ল ছ'ফুট উঁচু ওয়েলার।

হীরা সিংও থেমে পড়েছে ততক্ষণে।

আকাশের পূব কোণে একখণ্ড মিশকালো মেঘ উঁকি মারছে।

মেঘের দিকে তাকিয়ে দীপকনারায়ণ বললেন, ঝড় উঠবে হীরা সিং, বাড়ীতে তোমার রাণীমা একা সামলাতে পারবে না খোকাকে।

বিশ্বস্ত হীরা সিংও ভয় পেয়েছিল আকাশের ভীষণ-দর্শন মেঘের দিকে তাকিয়ে।

এবার আমাদের ফিরতে হবে হুজুর। আর দেরী করলে ঝড়ের আগে পৌছানো সম্ভব হবে না। রাস্তা ভাল নয়।

তাই চলো হীরা সিং।

পিঠের ওপর বন্দুক ফেলে ঘোড়ার মুখ ফেরালেন দীপক-নারায়ণ।

ঝড়ের গতিতে ছুটিয়ে দিলেন ঘোড়া।

সুন্দরপুর বিশ মাইলের পথ।

তার মধ্যে মাইল সাতেক জুড়ে ফতেপুর রিজার্ভ ফরেষ্ট।

ছোট্ট মেঘটা ততক্ষণে বিশালাকার এক দৈত্যের মত হু-হু করে ছড়িয়ে পড়েছে আকাশ জুড়ে।

ফতেপুর রিজার্ভ ফরেষ্টের মাঝামাঝি এসেছেন এমন সময় কোত্থেকে ভুঁই ফোঁড়ের মত জনা বিশেক লোক এসে পথ রোধ করে দাঁড়ালো।

প্রত্যেকের হাতে চকচকে রাম-দা।

দলের সামনে দাঁড়িয়ে পূর্ব বাংলার ত্রাস বদরমুন্সী।

ঘোড়ার রাশ টেনে ধরলেন জমিদার দীপকনারায়ণ।

পেছন থেকে পাশে এসে দাঁড়ালো হীরা সিং।

বন্দুক লোড করা আছে কিন্তু কাঁধে ঝুলান।

মাত্র হাত পাঁচেক দূরে ভয়ংকর বদরমুন্সী।

বদরমুন্সীর হাতে প্রকাণ্ড এক রাম-দা।

জমিদার শংকরনারায়ণের অত্যাচারে গ্রাম ছেড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল বদরমুন্সী।

আরো কাছে সরে এলো বদরমুন্সী।

জমিদার দীপকনারায়ণ কি চিনতে পারেন এই ক্ষতচিহ্ন ?

বাঁ হাতখানা তুলে ধরল বদরমুন্সী দীপকনারায়ণের চোখের সামনে।

জমিদার শংকরনারায়ণের বরকন্দাজের বল্লম সোজা এসে বিঁধে গিয়েছিল এই হাতে।

হাসবার চেষ্টা করল বদরমুন্সী।

ঝকঝক করে উঠলো কয়েকটা বড় বড় দাঁত।

ছ'ফুটের বেশী লম্বা পাথরের মত শরীর বদরমুন্সীর।

হীরা সিংয়ের হাতের মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরা আছে ঘোড়ার লাগাম।

হু-হু করে সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে কালো মেঘ।

স্বর্ণময়ী দোতলার ছাদে গিয়েছিলেন কাঁথা উল্টে দিতে।

চোখ পড়ল পূব-আকাশের মেঘের ওপর।

কালো একখণ্ড মেঘ উঁকি মেরেছে পূব-আকাশে।

চমকে উঠলেন স্বর্ণময়ী।

ত্বপুরের খাওয়া সেরে ঘুমাচ্ছে চন্দন।

মেঘের গায়ে ঝড়ের লক্ষণ। যদি ঝড় ওঠে একা তাঁর পক্ষে চন্দনকে সামলানো সম্ভব হবে না।

তাড়াতাড়ি শোবার ঘরে নেমে এলেন স্বর্ণময়ী।

একে একে ঘরের সব ক'টা দরজা জানালা বন্ধ করে দিলেন।

বেঘোরে ঘুমাচ্ছে চন্দন।

সমস্ত কাজ ফেলে স্বর্ণময়ী বিছানায় উঠে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন চন্দনকে।

বাইরে বাতাস সোঁ-সোঁ শব্দ করতে স্থরু করেছে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে ঝড় উঠলো। স্থরু হল মেঘের গর্জন।

কড়-কড়-কড়াৎ।

বাজ পড়ল কোথায়।

চন্দনকে আরো শক্ত করে চেপে ধরলেন স্বর্ণময়ী তাঁর বুকের মধ্যে।

ভৃত্য শিবুকে ডেকে বললেন, খোকা যেন কিছুতেই বাইরে যেতে না পারে।

বাজ পড়ার শব্দে চোখ মেলল চন্দন।

ঠিক সেই মুহূর্তে আবার বাজ পড়ল কোথায়।

মায়ের বুকের মধ্যে থেকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠলো চন্দন। কোত্থেকে অযুত হস্তীর বল এসেছে ওর ছোট্ট শরীরে।

ধরে রাখতে পারলেন না স্বর্ণময়ী।

স্বর্ণময়ীর চোখের সামনে দিয়ে দরজার দিকে অগ্রসর হচ্ছে চন্দন।

হাতের কাছে কাঁসার ভারী গ্লাস ছিল।

গ্লাসের আঘাতে আহত করে ফেলে দিয়ে চন্দনকে আটকে রাখতে পারেন স্বর্ণময়ী।

গ্লাসটা হাতের মুঠোয় তুলে নিলেন স্বর্ণময়ী।

দরজার খিলের ওপর হাত রেখেছে চন্দন। এক্ষুনি দরজা খুলে বাইরের ঝড়ের মধ্যে কোথায় বেরিয়ে যাবে!

হাত তুললেন স্বর্ণময়ী। কিন্তু গ্লাস তাঁর হাতেই ধরা রইল।

দরজা খুলে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল চন্দন।

শিবু ওকে যেতে দিস না।

কাঁসার গ্লাসটা হাতে নিয়েই চীৎকার করতে করতে মেঝেয় নেমে এলেন স্বর্ণময়ী।

চন্দন ততক্ষণে বাড়ীর সীমানা ছাড়িয়ে সামনের আমবাগানের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

সুন্দরপুর জমিদার বাড়ী গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে।

জমিদার বাড়ীর সীমানা ছাড়িয়ে সুরু হয়ে জমিদার শংকর-নারায়ণের নিজের হাতে লাগানো আমবাগান।

বাগানের শেষে আবাদী জমির সুরু যার সীমানা চলে গেছে আধ মাইল দূরে শীতলক্ষার পাড় পর্যন্ত।

আম বাগানের মধ্যে দাঁড়িয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল চন্দন।

ঝোড়ো বাতাসের নিঃশ্বাস।

আবার ছুটে চলল। কে যেন ডাকছে চন্দনকে। দূর থেকে কে যেন হাতছানি দিচ্ছে তাকে।

বাগানের সীমানায় চষা মাঠ।

ঝুপ-ঝুপ করে বৃষ্টি নামলো।

চন্দন খুশী।

জল-জল-জল, আনন্দে নাচতে সুরু করল চন্দন তার ছোট ছোট হাত তুলে।

ঝুপ-ঝুপ বৃষ্টি পড়ছে চন্দনের গায়ে। বৃষ্টি পড়ছে চষা মাঠে।

জল জমে উঠেছে চষা জমিতে।

মাঠে নেমে কাদার মধ্যে ছুটতে সুরু করল চন্দন।

বার কয়েক কাদার মধ্যে গড়াগড়ি দিয়ে নিল ছুটতে ছুটতে।

মুঠো মুঠো কাদা তুলে চন্দন মাখতে সুরু করল গায়ে মুখে মাথায়।

চন্দন খুশী।

চন্দন খুশীতে ডগমগ করছে।

কড়-কড়-কড়াৎ··· !

বাজ পড়ল দূরের তালগাছের মাথায়।

সোঁ-সোঁ করে বাতাস শব্দ করে উঠলো।

কে যেন ডাকছে তাকে।

কে ?

আবার ছুটতে সুরু করে চন্দন।

সামনেই শীতলক্ষা।

প্রাণপণে ছুটতে থাকে চন্দন।

বাতাসে ঢেউ উঠেছে শীতলক্ষার।

ঢেউয়ের শব্দ উঠছে খল-খল-খল-খল।

চন্দনের মনে হচ্ছে শীতলক্ষা বলছে, বন্ধু এসো, বন্ধু এসো।

ছুটতে ছুটতে শীতলক্ষার কূলে গিয়ে পৌঁছাল চন্দন।

শীতলক্ষার বুকের অসংখ্য ঢেউ শব্দ তুলছে খল-খল-খল-খল।

আমি এসেছি বন্ধু।

চীৎকার করে উঠলো, এইতো আমি এসেছি।

চন্দনের দৃষ্টি শীতলক্ষার দিকে তাকিয়ে আনন্দে ঝিকমিকিয়ে ওঠে।

বন্ধু সাড়া দেয় খল-খল-খল-খল, এসো এসো এসো এসো।

বদর মুন্সির সঙ্গে কথা বলতে হলে ঘোড়ায় চড়ে কথা বলা চলে না হুজুর।

জমিতে নেমে আসুন।

দীপকনারায়ণ আকাশের দিকে তাকান।

কালো মেঘ আকাশের প্রায় সবটাই গ্রাস করে ফেলেছে।

বাতাসে বইছে ঝড়ের গন্ধ।

ওদিকে পথরোধ করে ডান হাতের 'রাম-দা'খানা বাঁ হাতের তালুতে ধীরে ধীরে ঠুকছে বদর মুন্সি।

বন্দুকে হাত দিতে গেলে তার আগেই বদর মুন্সির হাতের রাম-দা ঘাড় লক্ষ্য করে ছুটে আসবে। তার আগেই ঝাঁপ দেবে বিশজন মানুষ।

হীরা সিং নির্বাক।

বদর মুন্সি ?

দীপকনারায়ণ চাপা কণ্ঠে গর্জন করে ওঠেন।

জমিদার শংকরনারায়ণ হুকুম করতেন এই বদর মুন্সিকে। আপনিও হুকুম করতে চান ?

পথ ছেড়ে দাও বদর মুন্সি।

দীপকনারায়ণের ক্ষমতা থাকে পথ করে এগিয়ে যান। পথ ছেড়ে দেবার জন্যে এতোদিনের পরিশ্রম সার্থক করেনি এই বদর মুন্সি।

আরো ক'টা দাঁত বেরিয়ে আসে বদর মুন্সির।

সাপের মত দুটো হিংস্র দৃষ্টি গিয়ে পড়ে দীপকনারায়ণের মুখের ওপর।

এক মুহূর্তের সুযোগ।

আত্মগর্বে গর্বিত বদর মুন্সির এক মুহূর্তের আত্মতৃপ্তি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছে হীরা সিং।

চোখের পলকে কাঁধ থেকে বন্দুক নামিয়ে এনে তুলে ধরেছে বদর মুন্সির বুক লক্ষ্য করে।

খবর্দার।

চীৎকার করে ওঠে হীরা সিং।

বনভূমি কেঁপে ওঠে হীরা সিংয়ের চীৎকারে।

বুক সম্ভবত বদর মুন্সিরও কেঁপে ওঠে, তবে হীরা সিংয়ের চীৎকারে নয়, হীরা সিংয়ের বন্দুকের দিকে তাকিয়ে।

ততক্ষণে দীপকনারায়ণও তাঁর বন্দুক বাগিয়ে ধরেছেন।

এবার বদর মুন্সি?

মৃদু হাসলেন দীপকনারায়ণ।

হতভম্ব হয়ে গেছে বদর মুন্সি।

হাতের রাম-দা নীচে নেমে আসে।

বদর মুন্সি অতীতে একবার হার মেনেছিল জমিদার শংকর-নারায়ণের কাছে। আজ আর একবার হার মানলো জমিদার দীপকনারায়ণের কাছে।

হাতের রাম-দা মাটিতে ফেলে দিয়ে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে দীপক-নারায়ণের মুখের দিকে তাকালো বদর মুন্সি।

চালান হুজুর।

সব ক'টা গুলি চালিয়ে ঝাঁজরা করে দিন এই বুক। যে বুকে পরাজয়ের গ্লানি আছে সেই বুকের নিঃশ্বাস নেবে না বদর মুন্সি।

বন্দুকের ট্রিগারে আঙুল বসালো হীরা সিং।

দেবো হুজুর একেবারে শেষ করে?

না হীরা সিং। ওকে যেতে দাও। ওর মত সাহসী লোকের দরকার আছে বাংলায়।

তাহলে আর দেরী করবেন না, দেরী করলে খোকাবাবুকে নিয়ে মুস্কিলে পড়তে হবে।

হাতের রাম-দা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পথ থেকে সরে দাঁড়ালো বদর মুন্সি।

ওরা যখন বাড়ী পৌঁছালো তার আগেই বেরিয়ে পড়েছে চন্দন।

গেটের দরজায় হাত দিয়ে শূণ্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন স্বর্ণময়ী।

দীপকনারায়ণ ঘোড়া থেকে নেমে হীরা সিংয়ের কাছে গিয়ে তার দুটো হাত ধরে বললেন, এই কিছুক্ষণ আগেও তুমি আমার জীবন ফিরিয়ে দিলে হীরা সিং। খোকাবাবুকে ফিরিয়ে এনে আর একবার আমাকে বাঁচাও হীরা সিং।

রাত আটটার সময় সর্বাঙ্গে কাদা মেখে হীরা সিং ফিরে এলো।

হীরা সিংয়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়া চন্দন।

আর একদিনের কথা।

ঝড়ের গন্ধে ঘুম ভেঙে গেল চন্দনের।

ঘরের মধ্যে জমাট বাঁধা অন্ধকার।

আলো জ্বালিয়ে শোয়া স্বর্ণময়ীর চিরকালের অভ্যাস।

আজো রাত্রে আলো জ্বালিয়েই ঘুমাতে গিয়েছিলেন স্বর্ণময়ী।

বাতাসে কখন নিভে গেছে আলো।

চারিদিকে ঘন অন্ধকার।

বিছানায় উঠে বসল চন্দন।

বাইরে বাতাসের শব্দ হচ্ছে।

চন্দনের কানের কাছে কে যেন ফিসফিসিয়ে উঠলো। বন্ধু এসো, বন্ধু এসো।

নিশ্চয়ই যাবে চন্দন। বন্ধুর ডাকে তাকে সাড়া দিতেই হবে।

পা টিপে টিপে গিয়ে দরজা খুলে ফেলল।

আর তুটো দরজা খুলতে পারলেই সামনে বাগান।

বাগানে নামার সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে সুরু করল বাগানের সরু পথ ধরে।

মোরগ ডাকার এখনো অনেক দেরী, তবু বিছানা এবং সালমা তু'য়েরই মায়া ত্যাগ করে উঠে পড়ল রহিম শেখ।

সালমা তার নতুন চুড়ি ঘেরা একখানা হাত এগিয়ে দিয়েছিল রহিম শেখকে আঁকড়ে ধরার জন্যে কিন্তু তার আগেই উঠে পড়েছে রহিম শেখ।

জাল গুছিয়ে বৈঠা নিয়ে নদীর ধার পর্যন্ত যেতে বেশ কিছু সময় লেগে যাবে।

বড় জোর আর তুটো মাস ইলিশের সময়।

সালমা আজ পাঁচ বছর ধরে আছে। বাকী জীবন ভরেই রহিম শেখের কোলের কাছে থাকবে সালমা। কিন্তু ইলিশ আবার সেই এক বছর পরে।

মিঞা কি আজকাল সালমার চেয়ে ইলিশকে বেশী ভালবাসতে সুরু করেছেন?

কাল গোটা-পঁচিশ ইলিশ উঠেছিল রহিম শেখের জালে।

বাজার থেকে ফেরার সময় হাত ভর্তি কাচের চুড়ি এনে দিল লোকটা।

চুড়িতে তু'হাত ভরে উঠেছে সালমার।

রহিম শেখ কোন উত্তর দিল না।

হাতের চুড়ি ঝাঁকিয়ে শব্দ করল সালমা।

রহিম শেখের মন থেকে আপাতত সালমা বিদায় নিয়েছে। চকচকে রুপোর মত ইলিশের ঝাঁক উঁকি দিচ্ছে মনের মধ্যে।

জাল গুটোতে থাকে রহিম শেখ।

ঘরে ছোট একটা প্রদীপ জ্বলছে।

রহিম শেখের চওড়া বুক আরো ফুলে ফুলে উঠছে।

বলের মত হচ্ছে হাতের গুলি।

হাতের চুড়ি ঝাঁকিয়ে আর একবার রহিম শেখের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করল সালমা।

কোন দুঃখ নেই সালমার।

গাড়ী গয়না অফুরন্ত নিয়ে আসে রহিম শেখ।

খাওয়া পরা কোন কিছুরই অভাব রাখেনি।

শুধু মাঝে মাঝে বুকের মধ্যে খালি-খালি মনে হয় যখন পাশের বাড়ীর সাকিনা তার ফুটফুটে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে সালমার সামনেই আদর করতে থাকে, বুকের কাপড় সরিয়ে দুধ খাওয়ায়।

রহিম শেখ তাকে সব দিয়েছে, দিতে পারেনি শুধু একরত্তি একটা সন্তান।

লোকটার নিজেরও তার জন্যে দুঃখ কম নয়।

সাকিনার মত বাচ্চা ওর কোলে এলে কোন দুঃখই থাকতো না সালমার।

সালমাও সাকিনাকে দেখিয়ে দেখিয়ে বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতো।

সাকিনার মত শুধু চামড়া চোষাতো না। বুকভরা দুধ খাওয়াতো ছেলেকে।

জাল কাঁধে নিয়ে বৈঠা বগলদাবা করে রহিম শেখ বেরিয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল সালমা।

আজানের এখনো অনেক দেরী। এতো রাত থাকতে কোথায় যায় লোকটা!

কাপড়টা কোমরে পেঁচিয়ে নিয়ে ঘরের শেকল তুলে দিয়ে পিছু নিল সালমা।

এতোদিন পর্যন্ত কোন বদনাম শোনেনি মিনসের।

তবু সাবধান হতে মন চায় সালমার।

ভিমরতি কখন যে কাঁধে চাপে কেউ বলতে পারে না।

অবশ্য খারাপ হবার হলে অনেক আগেই খারাপ হতে পারতো। সালমা আসারও আগে।

মাথার ওপরে কেউ ছিল না।

সাত বছর বয়সে বাপ মারা যায়। মাও বাপের শোকে প্রাণ হারায়।

সেই থেকে একা একা মানুষ হয়েছে রহিম শেখ।

সালমা শুনেছে জমিদার দীপকনারায়ণের বাবা শংকরনারায়ণ নাকি লাঠিপেটা করেই মেরে ফেলেছিল রহমৎ শেখকে।

পর পর দু'বছর দেশে অজন্মা হবার পর তৃতীয় বছরের জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত আকাশে মেঘ না দেখে মানুষ যখন মৃত্যুর চিন্তা করছে শংকর-নারায়ণ হুকুম দিলেন দশ দিনের মধ্যে সমস্ত বাকী খাজনা মিটিয়ে দিতে হবে।

মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল মানুষের।

অথচ খাজনা মিটিয়ে দিতেই হবে। শংকরনারায়ণের খাজনা বাকী রেখে কারো নিস্তার নেই।

রহমৎ প্রমাদ গুণলেন।

বসতবাটি বাঁধা দিয়েও কারো কাছে হাওলাত পেলো না। কে টাকা দেবে? সকলেরই একই অবস্থা।

রহমৎ শেখের দিন কাটে চিন্তায়, রাত ফুরোয় বিনিদ্রায়।

ঘরে একমুঠো চাল নেই অথচ জমিদারের খাজনার তাগাদা!

সাত বছরের রহিম ঘোরে-ফেরে আর বাড়ী এসে পাক-ঘরের দিকে তাকায়।

সাত বছরের রহিম হয়ত সব বোঝে, তাই কিছু বলে না মুখে।

যন্ত্রণায় কলিজাটা চেপে ধরতে চায় রহমৎ।

কিন্তু কোন উপায় খুঁজে পায় না।

একদিন দু'দিন করে দশদিন কেটে গেল।

রহমৎ ভেবেছিল রহিম আর তার মাকে নিয়ে কোন এক দিকে চলে যাবে। যাওয়া হল না তার। তার আগেই জমিদারের শমন নিয়ে এলো বরকন্দাজ।

বরকন্দাজের হাতে পায়ে ধরে একদিনের সময় চাইল রহমৎ।

সময় দিল না বরকন্দাজ, বেঁধে নিয়ে গেল রহমৎ শেখকে।

সকালবেলা নিয়ে গিয়েছিল, ফিরিয়ে দিয়ে গেল একেবারে সন্ধ্যেবেলা। নিজে ফিরে আসার ক্ষমতা ছিল না রহমৎ শেখের।

রহমৎ শেখের অজ্ঞান দেহটা উঠানের ওপর আছড়ে ফেলে রেখে গিয়েছিল জমিদার শংকরনারায়ণের বরকন্দাজের দল।

রহিম শেখের বয়স তখন সাত বছর।

তিনদিন তিনরাত অজ্ঞান থাকার পর রহিমের মা মাটির ব্যবস্থা করেছিল রহমৎ শেখের।

আজো রহিম শেখের গায়ে চাবুকের সাদা সাদা দাগ আছে। রহিম শেখ নিজে সালমাকে দেখিয়েছে।

মাটি দেবার খরচের জন্যে ভিক্ষে করতে পাঠিয়েছিল রহিমের মা তার রহিমকে জমিদারের কাছে।

জমিদার শংকরনারায়ণ নিজে উঠে এসে সদ্য পিতৃহীন নাবালকের অঙ্গে চাবুকের প্রহার করেছিলেন গুণে গুণে দশটা।

তার কিছুদিন আগেই মাত্র এক থেকে দশ গুণতে শিখেছিল রহিম শেখ।

মিনসে অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

জোরে হাঁটা সুরু করল সালমা।

বাড়ী থেকে শীতলক্ষ্যা মিনিট দশেকের পথ।

গ্রামের এক প্রান্তে ঘর চারেক মাত্র মুসলমানের বাস। আজকাল চার ঘরই মাছ ধরে সংসার চালায়।

শীতলক্ষ্যায় ইলিশ মাছের আমদানীও বেশ হয়।

সারা বছরের মত আহ্লাদ এই সময়েই মিটিয়ে নেয় ঐ চার ঘর মানুষ।

আকাশে কখন মেঘ জমেছে লক্ষ্য করেনি সালমা।

হঠাৎ দমকা বাতাস এসে মাথার চুল এলোমেলো করে দিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ল সালমা।

মিশ কালো মেঘ আকাশময় ছড়িয়ে রয়েছে।

ঝোড়ো বাতাস বইতে সুরু করেছে।

ঝড় উঠলে শীতলক্ষা রাক্ষসীর রূপ ধারণ করে। তখন মাছ ধরতে যাওয়ায় বিপদেরই সম্ভাবনা।

রহিম শেখের এদিকে লক্ষ্য নেই।

তার চোখের সামনে গতকালের ইলিশ মাছগুলো নেচে বেড়াচ্ছে। আজ যদি আবার গতকালের মত মাছ ওঠে তাহলে সালমাকে নিয়ে গিয়ে পীরের দরগায় সিন্নি দিয়ে আসবে রহিম।

এই মিঞা!

চমকে উঠে পেছন ফিরে তাকালো রহিম শেখ।

রহিমের হাতে তখনো জাল ধরা আছে।

সবে দাঁড় দু'খানা নৌকার ওপরে রেখেছে।

সালমা, তুই?

মনে আশংকা, তবু মুখে হাসি টেনে আনে সালমা: আজ আমি যাবো তোমার সঙ্গে।

সালমা!

চকচকে ইলিশের মত আমিও লাফালাফি করব তোমার নৌকার খোলের মধ্যে, কি মানাবে না?

ঝড় উঠেছে সালমা।

তাহলে তুমিও যাবে না।

সালমা অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে রহিম শেখের মুখের ভাষা বুঝতে চায়।

ঝড়ের মধ্যে আমাকে নিয়ে যেতে তোমার যদি ভরসা না হয়, আমি কোন ভরসায় তোমাকে যেতে দেবো ?

রহিম হেসে উঠলো।

হাতের জাল ধপাস করে নৌকার পাটাতনে ফেলে রেখে এগিয়ে গিয়ে সালমার একটা হাত ধরল।

বাধা দিল না সালমা।

চারিদিক তাকিয়ে দেখে নিল কেউ আছে কিনা।

নির্জন নদীতীর, কেউ নেই।

তুই আমাকে খুব ভালবাসিস সালমা, তাই না ?

রহিম ওকে কাছে টানে।

আমার কথা রাখবে মিঞা ?

কি ?

আজ ঝড় উঠবে। দেখছো না কি রকম জোরে বাতাস বইতে সুরু করেছে ? আজ যেও না।

একটা দিনে কতগুলো টাকা ঘরে আসবে জানিস ? ক'টা দিন যাক, দেখবি রুপো দিয়ে তোকে মুড়িয়ে দেবো।

চাই না আমার রুপো।

ঝামটা মেরে উঠলো সালমা।

বাতাসের বেগ ক্রমশই বাড়ছে।

ফুলে উঠছে শীতলক্ষার জল।

কথা দাও মিঞা আজ যাবে না ?

রহিম হাসতে থাকে অবুঝ সালমার বোকা আব্দার শুনে। এমন মূর্খ কেউ আছে যে, সামনে চকচকে টাকা সব পাখা মেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে অথচ হাত বাড়িয়ে ধরবে না !

জাল বাঁধতে থাকে রহিম শেখ।

বাতাস বইছিল শুধু এতক্ষণ। এবার ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাতে সুরু করল। সেই সঙ্গে মেঘের গর্জন।

হঠাৎ বুক চিতিয়ে দাঁড়ালো রহিম শেখ।

ওর দৃষ্টি চলে গেছে চষা মাঠের দিকে।

আর একবার বিদ্যুৎ চমকালো সেই সময়।

এক লাফে নৌকায় উঠে গলুই থেকে প্রকাণ্ড একখানা রাম-দা টেনে বের করে আনলো রহিম শেখ।

হঠাৎ রহিম শেখের এই পরিবর্তনে বিস্মিত হল সালমা।

মাঝে মাঝে কি হয় যেন লোকটার! এমনিতে সব ভাল, শুধু মাঝে মাঝে কেমন যেন গোঁ ধরে।

নৌকার গলুই থেকে রাম-দা বের করে আসতে দেখে সালমা রহিমের সামনে এগিয়ে গেল।

রাম-দা বের করছো কেন?

খোদা বড় মেহেরবান সালমা।

হেসে উঠলো রহিম শেখ।

বিদ্যুতের আলোয় সালমা রহিমের চোখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হল। চোখ দুটো যেন বাঘের মতো জ্বলছে।

আবার কি মেহেরবানি করল খোদাতালা?

সালমা শুধায়।

অনেকদিনের একটা হিসাব মিটিয়ে ফেলার সুযোগ খোদাতালা এনে দিয়েছে সালমা।

তার মানে?

মনে আছে সালমা, জমিদার শংকরনারায়ণ বাপজানকে সারাদিন ধরে পিটিয়ে মেরে ফেলে সন্ধ্যেবেলা তার দেহটাকে কেমন করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল উঠানের ওপর?

আমার মনে থাকবার কথা নয়। তুমিই একদিন বলেছিলে সেকথা।

কবরের খরচ চাইতে গিয়েছিল সাত বছরের বালক। শয়তান তাকেও দয়া করেনি সালমা। গুণে গুণে চাবুক মেরেছিল। রক্ত ফিনকি দিয়ে উঠেছিল দাগে দাগে।

হাঁপাতে থাকে রহিম শেখ।

পিঠে হাত দিয়ে দেখ সালমা, একটা দুটো করে দশটা দাগই তুই দেখতে পাবি এই হতভাগ্যের পিঠে। আজ এতোদিন পরে হিসাব চুকিয়ে দেবার সুযোগ এনে দিয়েছে খোদাতালা।

বোকার মত এদিক-ওদিক তাকায় সালমা। কিছুই দেখতে পায় না।

ওর চোখের সামনে ভাসতে থাকে রাম-দা হাতে রহিম শেখ।

আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না মিঞা।

দেখতে পাবি সালমা, সব দেখতে পাবি। আর একটু পরে রক্তের বদলে যখন রক্ত ঝরবে তখন সব দেখতে পাবি।

ভয় পায় সালমা রহিম শেখের এইসব কথাবার্তায়।

বিদ্যুৎ চমকালো।

দিনের মত আলো ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে।

ক্ষণিকের আলোয় মাঠের দিকে তর্জনী তুলে রহিম শেখ উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, কিছু দেখতে পাচ্ছিস সালমা।

চমকে ওঠে সালমা।

জমিদার দীপকনারায়ণের একমাত্র ছেলে চন্দন।

ছেলেটা পায়ে পায়ে এই দিকেই এগিয়ে আসছে।

এবার বুঝতে পেরেছিস সালমা, কেন আমি খুশী হয়েছি ?

সালমার মুখ দিয়ে কোন কথা সরে না।

রাম-দায়ের একটা মাত্র কোপ।

দাঁতে দাঁত চেপে হিসহিস করে হেসে ওঠে রহিম শেখ।

অনেক খুন ঝরবে সালমা। বড় লোকের গায়ে খুন নাকি বেশি হয়। বাপজানের অনেক রক্ত ঝরিয়েছিল শয়তান

শংকরনারায়ণ। আজ রহিম বদলা নেবে শংকরনারায়ণের বংশের রক্ত ঝরিয়ে।

তুমি ওকে খুন করবে? ঐ দুধের ছেলেকে?

সালমার কণ্ঠস্বর আর্তনাদের মত শোনায়।

মাত্র একটা কোপ সালমা। তারপর দেহের খণ্ড দুটো শাতলক্ষার জলে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে দুনিয়ায় কোন স্বাক্ষী থাকবে না।

চন্দন আরো কাছে এগিয়ে আসছে।

হাতের রাম-দা শক্ত করে বাগিয়ে ধরে রহিম শেখ।

ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাতে থাকে।

চন্দন দেখতে পেয়েছে এদের। এই দিকেই এগিয়ে আসছে।

এমন ছেলেকে এই রাত্রে ছেড়ে দেয় যে মা, সে কেমন মেয়ে মানুষ কে জানে!

আহারে, কি সুন্দর ফুলের মত ছেলে!

বুকের মধ্যে তোলপাড় করে ওঠে সালমার।

সুপ্ত মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষায় ছুটে গিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরতে চায় সালমা।

চন্দন আরো কাছে এসে পড়েছে।

রহিমের দিকে তাকিয়ে সালমা দেখতে পায় এক বীভৎস হাসি ফুটে উঠেছে ওর মুখে।

হঠাৎ রহিমের সামনে এসে দাঁড়ায় সালমা।

দৃঢ়কণ্ঠে বলে ওঠে: তুমি ওকে মারতে পারবে না মিঞা।

সালমার কথায় অবাক হয়ে যায় রহিম।

সরে যা সালমা।

সাত আট বছরের ছেলের ওপর হাত উঠবে তোমার?

উঠবে, উঠবে সালমা। সেদিন জমিদার শংকরনারায়ণের হাতও উঠেছিল সাত বছরের দুধের শিশু রহিমের পিঠে*চালাবার

জন্যে। জমিদারের যদি হাত উঠতে পারে তাহলে এই অধম রহিমের হাত কেন উঠবে না বলতে পারিস?

অতশত আমি জানি না। রাম-দা ফেলে দাও মিঞা।

পথ ছেড়ে দে সালমা।

কিছুতেই না।

সালমা!

পারো তো আগে আমার গলায় বসাও তোমার ঐ রাম-দা। তারপর ওর গলায় বসিও।

চন্দন সালমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

কেমন যেন বোকা-বোকা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে দু'জনের দিকে।

দয়ার কথা বলিস না সালমা। কলিজায় আমার বড় ঘা।

রহিম এগোতে থাকে।

খোকাবাবু তুমি পালাও।

চীৎকার করে ওঠে সালমা।

খোকাবাবু দেখছো না? পালাও, পালাও।

রহিম শেখের হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পালাতে পারবে না সালমা। তুই বৃথা চেষ্টা করছিস ওকে বাঁচাবার।

ছেলে হলে ছেলের মর্ম বুঝতে মিঞা। পাঁচ বছরে দিতে পারলে একটা? কিসের জন্য তুমি ওকে খুন করতে চলেছো? একটা দেবার সামর্থ্য আছে?

ছুটে গিয়ে সালমা চন্দনকে বুকের মধ্যে টেনে নেয়।

হঠাৎ রহিম শেখের বুকের মধ্যে কে যেন তোলপাড় করতে থাকে।

সত্যিই তো পাঁচ বছর হয়ে গেল, সালমার কোলে কোন সন্তান তো এলো না।

মানুষের দু'বছর যেতে না যেতেই কোল জুড়ে রত্ন এসে পড়ে।

রহিমচাচা, তুমি আমাকে মারবে?

সালমার কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে রহিম শেখের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় চন্দন।

কই মারো, আমাকে মারো চাচা ?

হাত থেকে রাম-দা খসে পড়ে রহিমের।

হুহু করে ওঠে বুকের মধ্যে।

দু'হাতে জড়িয়ে ধরে তার বুকের ওপর চন্দনকে তুলে নেয়।

শান্তি, শান্তি—শান্তিতে ভরে উঠছে রহিমের অতৃপ্ত বুক।

সামান্য এক শিশুর স্পর্শে এতো শান্তি!

উত্তপ্ত দেহ একটু একটু করে শীতল হয়ে আসছে।

দু'চোখ বেয়ে অশ্রুর ধারা নেমে আসে রহিমের।

জল আসে সালমার চোখেও।

সে রাত্রে আর মাছ ধরা হয় না। ইলিশের কথা ভুলে যায় রহিম। চন্দনকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে রহিম বলে, চল সালমা খোকাবাবুকে বাড়ী পৌছে দিয়ে আসি।

জাল আর রাম-দা নৌকার খোলের মধ্যে রেখে তালা বন্ধ করে জমিদারবাড়ীর দিকে রওনা হয় সালমা আর রহিম শেখ।

চন্দন ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে শেখের বিশাল বুকের ওপর।

জমিদারবাড়ীর গেটের কাছে ওরা যখন পৌছায় মসজিদে তখন আজান দিচ্ছে।

জমিদারবাড়ীতে কান্নাকাটি পড়ে গেছে।

যে যেদিকে পেরেছে চন্দনের খোঁজে বেরিয়েছে।

দীপকনারায়ণ গেটের দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।

দূর থেকে রহিম শেখকে দেখতে পেলেন দীপকনারায়ণ।

আর একটু কাছে এসে চন্দনকে দেখতে পেলেন রহিম শেখের কোলে।

সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠলো দীপকনারায়ণের।

দুর্দান্ত রহিম শেখের কথা অজানা নেই দীপকনারায়ণের। রহিম শেখের বাপের খবরও দীপকনারায়ণ জানেন।

সেই রহিম শেখের কোলে চন্দনকে দেখে শিউরে উঠলেন দীপক-নারায়ণ।

খোকাবাবু ঘুমিয়ে পড়েছে, বাবু।

রহিম নত মস্তকে এসে দাঁড়ালো দীপকনারায়ণের সামনে।

ছোঁ মেরে ছেলেকে কোলে তুলে নিলেন দীপকনারায়ণ।

কোথায় পেলে একে ?

নদীতে মাছ মারতে গিয়েছিলাম বাবু, দেখলাম, খোকাবাবু একা অন্ধকারের মধ্যে নদীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

তারপর ?

সালমা দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে ধরে ফেলে খোকাবাবুকে।

রহিম শেখ !

দীপকনারায়ণের কণ্ঠস্বর ধরে এসেছে।

বাবু ?

তুমি আমার জীবনকে এনে দিয়েছ রহিম, অথচ বাবা একদিন এই রহিমের পিঠেই চাবুক চালিয়েছিলেন, তাই না রহিম ?

অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে রহিম।

ভগবানের কি বিচার দেখেছো ?

এবারো কোন উত্তর দিতে পারে না রহিম।

আয়, ভেতরে আয় রহিম, তুমিও এসো সালমা।

অনেক বছর পরে রহিম আবার এলো জমিদারবাড়ীর প্রাঙ্গণে।

পরের দিন সকালেই ভীষণ জ্বর এলো চন্দনের।

চার···পাঁচ···ছয়··· !

থার্মোমিটারের সীমানা ছাড়িয়েও যেন আরো ওপরে উঠে যেতে চায় জ্বর। হীরা সিংকে ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়ে নিজের হাতে জল ঢালতে বসলেন দীপকনারায়ণ।

ঢাকা থেকে সাহেব ডাক্তার এলো, গেলো কিন্তু জ্বর ছাড়বার কোন লক্ষণ নেই।

স্বর্ণময়ী দিন-রাত ছেলের শিয়রে বসে থাকেন।

দীপকনারায়ণ শিকার ভুলে পায়চারী করতে থাকেন মেঝের ওপর।

ঢাকা থেকে ডাক্তার ডাকা, ওষুধ আনা সব কাজ করে বিশ্বস্ত হীরা সিং।

মসজিদে খোদার কাছে প্রার্থনা জানায় রহিম শেখ আর পীরের দরগায় সিন্নি চড়ায় সালমা।

ওদেরও দিনের অনেক সময় কাটে জমিদার দীপকনারায়ণের বাড়ীতে।

বন্ধু, আমি যাচ্ছি!

মাঝে মাঝে চীৎকার করে ওঠে চন্দন।

স্বর্ণময়ী আঁকড়ে ধরেন ছেলেকে বুকের মধ্যে।

দীপকনারায়ণ হীরা সিংয়ের কাছে গিয়ে বলেন, ও যেন আর যেতে না পারে হীরা সিং।

সাতদিন ধরে যমে-মানুষে টানাটানি করবার পর জ্বর রেমিসান হল।

সাতদিন পরে এই প্রথম চোখ বুঁজলো স্বর্ণময়ী।

রাত তখন প্রায় দুটো হবে।

চন্দনের ঘুম ভেঙে যায়।

কানের কাছে শব্দ হয়ঃ ছলাৎছল, ছলাৎছল।

বন্ধুর কথা মনে পড়ে চন্দনের।

শীতলক্ষা তাকে ডাকছে।

বিছানা থেকে নেমে পড়ে চন্দন।

বন্ধু তাকে ডেকেছে, সে কি বন্ধুর ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারে?

চন্দন যাবে তার বন্ধুর কাছে।

মায়ের দু'চোখভরা ঘুম।

বাবাও ঘুমিয়ে পড়েছেন ইজি-চেয়ারে।

হীরা সিং ঢাকা গেছে পরের দিনের ওষুধ আনতে।

নিঃশব্দে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে চন্দন।

সামনে আম-বাগান পার হলেই মাঠ। আর মাঠের শেষ হলে শীতলক্ষা। দুর্বল দেহ কাঁপতে থাকে, তবু আম-বাগানের মেঠো পথ দিয়ে হাঁটতে থাকে চন্দন।

এবার মাঠ।

মাঠের শেষেই শীতলক্ষা।

মাঠের মধ্যে নেমেই শীতলক্ষাকে দেখতে পেয়েছে চন্দন।

এই যে আমি এসেছি, বন্ধু।

প্রাণপণে ছুটতে স্থরু করে।

কলকল শব্দে বইছে শীতলক্ষা।

ঘুম ভেঙে খোকাকে দেখতে পান না স্বর্ণময়ী।

খোকা!

গলায় যত জোর আছে আর্তনাদ করে ওঠেন স্বর্ণময়ী।

সেই চীৎকারে দীপকনারায়ণ উঠে পড়েছেন।

জেগে গেছে গোটা জমিদারবাড়ী।

ওগো, শুনছো?

স্বর্ণময়ী স্বামীর পায়ের ওপর আছড়ে পড়েন।

আমার খোকা আবার চলে গেছে। আমার খোকাকে এনে দাও, খোকাকে এনে দাও। খোকা···আ··· আ··· !

হতভম্ব হয়ে গেছেন দীপকনারায়ণ।

চন্দনকে পাওয়া গেলেও এবার কি ও বাঁচবে!

কই, শুনছো না কেন? তুমি কি পাথর হয়ে গেলে?

স্বর্ণময়ী উঠে দাঁড়িয়েছেন।

এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন দীপকনারায়ণের দিকে।

হীরা সিংকে ডাকতে গিয়েও থেমে যান দীপকনারায়ণ। তিনিই হীরা সিংকে ঢাকায় পাঠিয়েছেন ওষুধ আনার জন্যে।

বলো আমার খোকাকে কোথায় রেখেছো? বলো, বলো?

স্বর্ণময়ী এবার স্বামীর বুকের ওপর গিয়ে পড়েন।

তোমরা কেউ যাবে না। আমি নিজে গিয়ে এবার চন্দনকে নিয়ে আসবো।

দরজা খোলাই ছিল।

খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে আম-বাগানের মধ্যে ছুটতে থাকেন স্বর্ণময়ী।

দীপকনারায়ণ দেওয়ালে ভর দিয়ে রাখা বন্দুকটা তুলে নিয়ে স্বর্ণময়ীকে অনুসরণ করতে থাকেন।

চন্দন ততক্ষণে তার বন্ধুর কাছে এসে পড়েছে।

বন্ধু শীতলক্ষা যেন হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকছে।

শব্দ হচ্ছে খল-খল, খল-খল।

চন্দন শোনে বন্ধু ডাকছে, এসো-এসো, এসো-এসো।

এই তো, আমি এসেছি।

এসো-এসো-এসো।

আর তর সয় না চন্দনের।

ঝপাং করে ঝাঁপ দেয় শীতলক্ষার বুকের ওপর।

স্বর্ণময়ী চীৎকার করতে থাকেন: চন্দন, খোকা!

অভিজিৎ থেমে যায়।

রোশনারার মুখে কোন কথা নেই।

নৌকা তরতর করে এগিয়ে চলছে।

অনেক দূরে মিলিয়ে গেছে স্বর্ণময়ীর চীৎকার।

সেই থেকে শীতলক্ষার কূলে কূলে চন্দনকে ডেকে ডেকে ফেরেন স্বর্ণময়ী।

পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছতে থাকে অভিজিৎ।

আর জমিদার দীপকনারায়ণ?

বন্দুক নিয়ে সেই যে তিনি বেরিয়েছিলেন আর ফেরেন নি দীপকনারায়ণ।

তারপর থেকে আজ পর্যন্ত আর কেউ দেখতে পায়নি দীপক-নারায়ণকে।

লণ্ঠন হাতে নিয়ে যে লোকটা স্বর্ণময়ীর পেছনে পেছনে ছুটছে?

বিশ্বস্ত হীরা সিং।

হীরা সিং আজো বেঁচে আছে একজন বিশ্বস্ত কর্মচারীর মত।

আকাশে মেঘ উঠলে স্বর্ণময়ী যখন বেরিয়ে পড়েন, বৃদ্ধ হীরা সিংও তার পেছনে পেছনে ছুটতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না স্বর্ণময়ী জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েন।

স্বর্ণময়ীর জ্ঞানহীন দেহ তুলে আনে হীরা সিং।

আজকের দিনেও এমন বিশ্বস্ত মানুষ আছে অভিজিৎ?

আছে রোশনারা, নিশ্চয়ই আছে। নইলে এই দুনিয়া চলছে কি করে?

কে জানে!

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে রোশনারা।

সে কি! আমার প্রতিও কি তোমার বিশ্বাস নেই?

মনের ভয় দূরে সরিয়ে দেবার জন্যে পরিহাসের সুরে বলে উঠলো অভিজিৎ।

হেসে ফেলল রোশনারা।

রাত সাড়ে তিনটের সময় অভিজিতের নির্দেশে মচলন্দপুরের ঘাটে নৌকা ভেড়ালো মাঝি। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে অভিজিৎ রোশনারার হাত ধরে ঘাটের কূলে নামলো।

ঘাটের পরেই নারিকেল সুপারীর ছোট্ট একটা বাগান, আর তার পরেই সুরু হয়েছে মচলন্দপুর গ্রাম।

মচলন্দপুর হিন্দুপ্রধান গ্রাম।

আজো নেই-নেই করেও পঞ্চাশ ঘর হিন্দু এই গ্রামে রয়ে গেছে।

বৈজ্ঞানিক মানবেন্দ্র রায়ের ভরসাই ওদের সাহস।

চারিদিকে বারবার দাঙ্গা-হাঙ্গামা লুঠতরাজ হয়ে গেলেও মচলন্দ-পুরের দিকে আজো কেউ রক্তচক্ষু তুলে তাকাতে সাহস করেনি।

কুমারীর সিঁথির মত ছোট্ট আঁকাবাঁকা রাস্তা গ্রামের দিকে চলে গেছে সুপারী নারিকেল গাছের ভিতর দিয়ে।

এবার চলো রোশনারা।

আবার রোশনারা!

চাপা কণ্ঠে ধমকে উঠলো রোশনারা।

তুমিই দেখছি কখন বিপদে ফেলবে।

এখানে তো কেউ নেই!

অভ্যাস খরাপ হয়ে যাবে অভিজিৎ।

আচ্ছা, আচ্ছা, ঘাট হয়েছে আমার; এবার তুমি চলো।

রোশনারাকে এগিয়ে দিয়ে পেছনে রইল অভিজিৎ।

দু'পা গিয়ে তিন পা ফেলবার আগেই অভিজিৎ রোশনারার আঁচল টেনে ধরল।

কি হল?

ঘুরে দাঁড়ালো রোশনারা।

কোন হিন্দু বৌ-ই প্রথমবার মাথার ঘোমটা ফেলে দিয়ে শ্বশুর-বাড়ী আসে না।

সত্যিই খুব ভুল হয়ে গেছে, অভিজিৎ।

এই দেখো, আরো একটা ভুল করলে।

আবার ভুল!

রোশনারার কণ্ঠে হতাশা ফুটে ওঠে।

হ্যাঁ, আবার ভুল। স্বামীর নাম নিতে নেই, এটাও কি তুমি জানো না?

দাঁতে জিভ কাটলো রোশনারা।

দুটো ভুলের শাস্তি নিতে হবে তোমাকে।

কি শাস্তি দেবে ?

হাসতে থাকে রোশনারা।

তোমার মাথায় ঘোমটা তুলে দেবার অধিকার।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারে না রোশনারা।

কি ভাবছো ? অধিকার দেবে কিনা ?

না, তা ভাবিনি।

তবে ?

তোমার শাস্তি দাও।

দু'হাত দিয়ে রোশনারার মাথায় ঘোমটা দিতে গিয়ে দুটো হাতই কেঁপে উঠলো অভিজিতের।

আর দেরী নয় সমর্পিতা, এগিয়ে চলো।

এই তো, লক্ষ্মী ছেলে।

আচ্ছা, আমি তোমাকে কি বলে ডাকবো, তা তো বললে না ?

কেন ? ওগো—হ্যাঁগো। আমাদের পিতামহী, প্রপিতামহী, অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহীরা যা বলে তাঁদের মনের মানুষদের ডেকে এসেছেন ?

যদি আটকে যায় ?

মা ! ওরে বাবা, আমি জানি না কিছু।

ওগো, শুনছো ?

হাসতে থাকে রোশনারা।

কি, ঠিক হল তো ?

বাড়ীতে কে কে আছেন বলে দিলে না তো ?

ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছো সমর্পিতা। শোনো, বাড়ীতে গুরুজন বলতে আছেন মা, দুই কাকা ও কাকীমা আর এক বিধবা পিসী। আর দেখবে একগাদা ভাই-বোন।

আগেকার জমিদারদের মত দোতলা বাড়ী।

প্রতি বছর সংস্কার করা হয়, তাই রোশনারার চোখে নতুনই লাগলো।

সামনে অনেকখানি ফাঁকা মাঠ, মাঠ পেরিয়ে বাড়ী।

সীমানার মধ্যে ঢুকতেই বাঁদিকে একটা বটগাছ।

বটগাছের তলায় অনেকখানি জায়গা বাঁধানো।

বাঁধানো জায়গায় রোশনারাকে অপেক্ষা করতে বলে অভিজিৎ বাড়ীর দিকে এগিয়ে গেল।

অভিজিতের মা ভবতারিণীর নিজের হাতে গড়া সংসার।

ভোর চারটে বাজতে না বাজতেই ঘুম ভেঙে যায়।

আধঘণ্টার মত বিছানায় শুয়ে শুয়েই ইষ্টমন্ত্র জপ করে নেন, তারপর উঠে সারাদিনের মত লেগে যান সংসারের কাজে।

স্বামী চাকরী করলেও খামারের কাজও পুরোদমে চলে।

এতো রাত্রে ছেলের সাড়া পেয়ে ভবতারিণী বিস্মিত হলেন। অভিজিতের এ সময়ে আসার কথা নয়। কে জানে, আবার কোথায় কি হল!

সরকারী নিশ্চিন্ততা থাকলেও ভবতারিণীর মনের ভয় যায় না।

হ্যারিকেনটা উস্কে দিয়ে নেমে এলেন।

মা বেরিয়ে আসতেই ঢিপ করে মস্ত এক প্রণাম করে বসলো অভিজিৎ।

ভবতারিণী আরো বেশী চিন্তিত হলেন অভিজিৎ হঠাৎ প্রণাম করায়। ছেলেকে তিনি ভালভাবেই জানেন।

কিরে খোকা? এতো রাত্রে কোত্থেকে এলি?

হাতের আলোটা তুলে ধরলেন ছেলের মুখের ওপর।

বার দুয়েক ইতঃস্তত করে অভিজিৎ বলল, এপাশে একটু সরে এসো মা, বিশেষ জরুরী কথা আছে।

ভেতরে চল। তারপর কথা হবে।

না মা, এখানেই তোমাকে শুনতে হবে।

চিন্তিতা ভবতারিণী ছেলের মুখের দিকে তাকালেন।

ভাল কি মন্দ জানি না মা কিন্তু একটা কাজ করে এসেছি। যদি মেনে নিতে পারো ভেতরে যাই, আর যদি অস্বীকার করো নিঃশব্দে বেরিয়ে যাবো মা। কিন্তু একটা অনুরোধ, যদি চলেই যেতে হয় চেঁচামেচি করে দৃশ্য তৈরী করবে না।

কি করে এসেছিস অভি?

ভবতারিণী ছেলের আরো কাছে সরে গেলেন।

কি এমন কাজ করে এসেছিস যে কাজের কথা বলতে মায়ের সামনেও ইতঃস্তত করতে হচ্ছে।

আগে তোমাকে কথা দিতে হবে মা, তুমি কোনরকম গোলমাল করবে না।

উত্তর দিতে একটু সময় নিলেন ভবতারিণী।

নানান আশংকা মনের মধ্যে ঘুরে গেল।

ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রতিশ্রুতি দিলেন: আমি তোকে কথা দিচ্ছি, অভি। কিন্তু তাড়াতাড়ি যা বলবি বল। আমার আর সবুর সইছে না।

আমি বিয়ে করে বৌ নিয়ে এসেছি মা। কাল বিয়ে হয়েছে।

অভি!

কিছুক্ষণের জন্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন।

অভিজিৎ এসে মায়ের একটা হাত চেপে ধরল।

বল মা, তোমার ছেলের বৌকে গ্রহণ করবে কিনা। যদি না করো তুমি ভেতরে যাও, আমিও যেমন নিঃশব্দে এসেছি তেমনি বেরিয়ে যাই।

অভি, তুই বিয়ে করেছিস, আর মাকে খবর দিতে পারলি না?

আমি জানতাম মা তুমি আমাকে ফেরাতে পারবে না।

আনন্দে মাকে জড়িয়ে ধরল অভিজিৎ।

রোশনারার জন্যে আর কিছু করতে না পারুক একটু নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে পেরেছে।

ক'টা দিন স্বস্তিতে কাটাতে পারবে মেয়েটা।

তা বৌমাকে কোথায় রেখে এসেছিস?

ভয়ে ভয়ে ঐ বটগাছতলায় বসিয়ে রেখেছি, মা। আসতে বলব?

নইলে কি পরের মেয়ে বাকী রাত ঐ গাছতলাতেই বসে থাকবে নাকি? চল, বৌমাকে নিয়ে আসি।

গাছতলায় বসে অভিজিৎ আর তার মায়ের সব কথাই শুনতে পাচ্ছিল রোশনারা।

কেন যেন আপনা থেকেই চোখ দুটো সজল হয়ে উঠলো তার।

অভিজিতের মা এসে পড়েছেন।

হাতের আলো তুলে ধরলেন ছেলের বৌয়ের মুখের ওপর।

নীচু হয়ে জীবনে এই প্রথম হিন্দু প্রথায় কারো পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

আপনা হতেই মাথা নীচু হয়ে গেল রোশনারার।

এই না হলে মা!

এসো মা।

বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন ভবতারিণী রোশনারাকে তাঁর পুত্রবধু ভেবে।

অভিজিতের দিকে ফিরে বললেন, ওরে ডাক সকলকে। ডেকে দেখা আমার সোনার মত মাকে।

অভিজিৎ এগিয়ে যাচ্ছিল।

বাধা দিলেন ভবতারিণী।

না-না, তুই নয়, আমি নিজে গিয়ে সবাইকে ডেকে তুলি। বরণ করে তুলতে হবে যে!

আলোটা অভিজিতের হাতে দিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতেই এগিয়ে চললেন তিনি।

কেমন দেখলে মাকে?

অভিজিৎ তাকালো রোশনারার চোখের দিকে।

মায়ের মত দেখলাম।

তোমার দু'চোখে জল?

অভিজিৎ আলোটা রোশনারার একেবারে মুখের ওপর তুলে ধরল।

এ জল নিরাপত্তার জল অভিজিৎ।

এই!

একবার ভুল করলাম ইচ্ছে করেই। দ্বিতীয়বার এ ভুল আর হবে না।

চলো, এগিয়ে যাই।

তুমি কিন্তু কাছে কাছেই থাকবে। কখন কি ভুল করে বসি! আমার কিন্তু খুবই ভয়-ভয় করছে।

তুমি রোশনারা, ভয় পাচ্ছো!

মৃদু হাসলো অভিজিৎ।

যে মেয়ে পুলিশ মিলিটারী দেখে তোয়াক্কা করে না সেই মেয়ে একজন ভদ্রমহিলাকে ভয় পাচ্ছে?

তুমি হাসতে পারো। কিন্তু আমার কি মনে হচ্ছে জানো?

কি?

বন্দুকের শাসনের চেয়ে হৃদয়ের শাসন অনেক বেশী শক্তিশালী।

মা ভেতরে যাবার মিনিট কয়েকের মধ্যেই বাড়ীতে চেঁচামেচি স্নুরু হয়ে গেল।

খুড়তুতো, পিসতুতো ভাই-বোন মিলিয়ে সংখ্যায় অনেক। কেউ চোখ মুছতে মুছতে, কেউ জামা গায়ে দিতে দিতে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলো।

বড়রা পেছনে।

সবাই মিলে ঘিরে ধরল অভিজিৎ আর রোশনারাকে।

অভিজিতের পিসতুতো বোন শীলা সকলের গলা ছাপিয়ে চীৎকার করে উঠলো : অভিদা, বৌদির ডানা দুটো কোথায় রেখে এলে ?

হেসেই অভিজিৎ উত্তর দিল : এবার ঘরে বন্ধ হবার পালা কিনা, তাই ও দুটো অপারেশন করিয়ে নিয়ে এলাম।

শীলাও ছাড়বার পাত্রী নয়।

ও বলল, তা তুমি বৌদির দিকে তাকাচ্ছো কেন, মামীমা যে বললেন আজ কালরাত্তির ?

সত্যিই তো !

লজ্জার ভান করে অভিজিৎ বলল, সত্যিই, খুব অন্যায় হয়ে গেছে। তুই তাহলে তোর বৌদির ভার নে। আমি অন্য কোথাও গিয়ে ঢুকি।

মা ভবতারিণী এসে পড়েছিলেন।

এখনো অন্ধকার আছে বাবা, নারায়ণের দরজায় মাথা ঠুকে নিয়মটা পালন করবি চল।

সকলে মিলে হুড়োহুড়ি করতে করতে গৃহ-দেবতা নারায়ণের ঘরের সামনে গিয়ে হাজির হল।

আড়চোখে বারবার অভিজিতের দিকে চাইছিল রোশনারা।

এর সবটাই তার জীবনে অভিনয়। অভিনয় মনে করেই নারায়ণের সামনে গিয়ে প্রণাম করবে সে। কিন্তু অভিজিতের মা ? পরে যেদিন তিনি জানতে পারবেন নিশ্চয় ভয়ানক আঘাত পাবেন মনে।

অভিজিৎ বার কয়েক তাকিয়েছিল।

ওকেও ভয়ানক চিন্তিত মনে হচ্ছে।

কি ভাবছে অভিজিৎ কে জানে !

নারায়ণের সামনে বেশ সহজভাবেই প্রণাম সারলো রোশনারা।

অভিজিৎও প্রণাম করল। মনে মনে ক্ষমা চাইল তার নারায়ণের কাছে।

এবার নিজের ঘরের দিকে চলল অভিজিৎ।

রোশনারাকে শীলা এণ্ড কোম্পানী গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে।

গোটানো বিছানা বিছিয়ে নিয়ে নিজেকে ছুঁড়ে দিল অভিজিৎ।

নিদ্রাদেবী যেন ওৎ পেতেই ছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই অভিজিতের দু'চোখের পাতায় এসে ভর করলেন।

পরদিন অনেক বেলায় ঘুম ভাঙলো অভিজিতের।

তাকিয়ে দেখলো ওর পড়ার টেবিলের ফ্লাওয়ার-ভাসে ফুল রাখছে রোশনারা।

কোত্থেকে একগাদা ফুল যোগাড় করে এনেছে ?

ভোরেই স্নান সেরেছে।

মাথার চুল ছড়িয়ে দিয়েছে পিঠের ওপর।

চুলের ডগা বেয়ে বিন্দু বিন্দু জল পড়ছে।

ঐ রোশনারার দিকে তাকিয়ে কে বলবে যে, সে মুসলমানের মেয়ে!

ঘুম ভাঙলো ?

পাশ ফেরার শব্দে ঘুরে দাঁড়ালো রোশনারা।

এত ফুল কোত্থেকে আনলে ?

রোশনারা কিছু বলার আগেই বাইরের বারান্দা থেকে শীলা এণ্ড কোম্পানী খিলখিলিয়ে উঠলো।

আজ যে ফুলশয্যা, অভিদা!

শীলা এণ্ড কোম্পানী ঘরে ঢুকলো।

বৌদি তাই বেছে বেছে নিজের হাতেই তুলে এনেছেন।

অভিজিৎ হাসতে থাকে। হাসি ছাড়া আর কি-ই বা করতে পারে।

আচ্ছা, অভিদা!

কি ?

এমন মেয়েকে বাগালে কোত্থেকে ?

তোর বৌদিকে জিজ্ঞাসা কর কোথায় ও ফাঁদ পেতে বসেছিল।

কি বৌদি ?

শীলা বৌদির দিকে ফিরলো।

গালে রক্ত উঠেছে রোশনারার।

কি সব বকছো ?

ধমকাতে চেষ্টা করল অভিজিৎকে।

বলো না বৌদি ?

শীলা দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল রোশনারাকে।

আঃ, বৌদিকে বুঝি এমনি করে বিরক্ত করে ?

ঠাকুরঝিরা বৌদিদের কাছে এমনিই হয়, তাই না শীলা ?

আচ্ছা ঠাকুরঝি, তুমি কখনো···।

প্রেম করেছি কিনা, এই জানতে চাইবে তো ? তোমার কখনো বুদ্ধিশুদ্ধি হবে না দেখছি, দাদার সামনে বোনকে জিজ্ঞাসা করছো তার প্রেমের কথা ! করলেও বলবো নাকি ?

অপ্রস্তুতের হাসি হাসে রোশনারা।

অভিজিতের দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে শীলা বলল, কখনো একলা পেলে জিজ্ঞাসা কোরো তবে উত্তর পাবে।

এই শীলা, সকাল থেকেই জ্বালাবি নাকি ?

আজ ফুলশয্যা কি না দাদা, তাই দেখছি ফুলের আঘাতে বৌদি আমার মূর্ছা যাবেন কি না। আচ্ছা চলি, বৌদি। গুড বাই।

ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল শীলা।

তুমিও যাও।

অভিজিৎ ইসারা করে বলল, নইলে সবাই বদনাম দেবে যে অভিজিৎ বৌ-পাগলা।

বৌ-পাগলা বদনাম না সুনাম ?

হাসতে হাসতে রোশনারা বেরিয়ে যায়।

ভবতারিণী সামনের রবিবার বৌভাতের দিন ঠিক করে নিমন্ত্রণ করে এলেন গ্রামশুদ্ধ সবাইকে।

অনেক দিন পরে এ বাড়ীর বড় ছেলের বিয়ে।

স্বামীকে চিঠি লিখে জানালেন অভিজিতের বিয়ের কথা।

আজ রাত্রে ফুলশয্যার অনুষ্ঠান সেরে কাল থেকে নিমন্ত্রণের ব্যাপারে লেগে পড়বেন স্থির করেছেন ভবতারিণী।

অভিজিৎ সারাদিন বাড়ীর বাইরে বের হল না।

সব সময় রোশনারার কাছাকাছি থাকবার চেষ্টা করল। হিন্দুর মেয়ে হলে কথা ছিল না। একেবারে ভিন্ন সমাজের মেয়ে। যত বিদ্বান যত বুদ্ধিমতীই হোক একটা কিছু ভুল করে ফেললে কেলেঙ্কারীর একশেষ। ধরা পড়ে গেলে কি যে হবে ভাবতেও ভয় পায় অভিজিৎ।

সরকারী কোপ-দৃষ্টি নেমে আসবে পরিবারের ওপর। হয়ত পাকিস্তানে বাস করাই অসম্ভব হয়ে পড়বে।

রোশনারার জীবনও বিপদাপন্ন হয়ে পড়বে।

এদিকে যতই সন্ধ্যে হচ্ছে বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ সুরু হচ্ছে। অভিজিতের এক ঘর, এক বিছানা ; ঘরে সারারাত্রির মত রোশনারার সঙ্গে কাটানো—ভয় সেখানেই।

রাত দশটার মধ্যে ওদের ছ'জনের খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে দরজার শেকল এঁটে দিল শীলা এণ্ড কোম্পানী।

দোতলার সবচেয়ে সেরা ঘরখানা সারা ছপুর ও বিকেল ধরে শীলার নেতৃত্বে সাজিয়েছে মেয়েরা।

ঘরের মধ্যে ঢুকতেই পরিচিত অনেকগুলো গন্ধ নাকে এলো।

রোশনারাকে ফুলের সাজে সাজিয়েছে।

ঘেমে উঠছে অভিজিৎ।

দেখতে লোভ হচ্ছে রোশনারাকে। ও যেন এইমাত্র স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে অভিজিতের ঘরে।

বাইরে মেয়েদের চাপা-হাসি কানে আসছে।

এগিয়ে গিয়ে দরজার খিল তুলে দিয়ে দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে পড়ল অভিজিৎ।

ঘরে উজ্জ্বল জাপানী টেবিল-ল্যাম্প জ্বালিয়ে রেখে গেছে।

ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে রোশনারা।

বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে ওর মুখে।

গলাটা শুকিয়ে যাচ্ছে।

জল রাখা ছিল টেবিলের ওপরে।

জলে গলা ভিজিয়ে আবার আগের জায়গাতেই এসে দাঁড়ালো রোশনারা।

ছু'জনেই কি বোবা হয়ে থাকবে নাকি ?

বাইরে থেকে শীলার কণ্ঠ শোনা গেল।

আমরা আর কতক্ষণ মশার কামড় খাবো বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ?

কে একজন বলে উঠলো, কিছু গুঞ্জন শুনিয়ে দাও বৌদি, রাত বেশী হচ্ছে।

আরে চল চল, কথা আবার এখনো বাকী আছে নাকি ?

বারান্দায় দুপদাপ শব্দ হল।

অভিজিতের চিন্তা করা উচিৎ ছিল, সন্দেহের কোন অবকাশই দেওয়া ঠিক নয়।

ওরা যতই যাবার ভান করুক অপেক্ষা করবেই।

এই সব ব্যাপারে মেয়েদের ধৈর্যের কথা জানা আছে অভিজিতের। ওরা সারারাত মশার কামড় খেয়ে কাটিয়ে দিতে পারে।

অভিজিৎ সরে এসে রোশনারার কাঁধে হাত রাখলো।

চমকে উঠলো রোশনারা।

বড় বড় চোখ তুলে চাইলো অভিজিতের দিকে।

এবার ?

অভিজিৎ তাকালো রোশনারার চোখের দিকে।

অভিজিতের দৃষ্টি পড়তেই রোশনারা চোখ নামিয়ে ফেলল।

এ রকম করে দাঁড়িয়ে থাকলে ওরা সন্দেহ করতে পারে।

যা হয় একটা কিছু করো।

বাইরে হাসির শব্দ শোনা গেল।

সিনেমা সুরু হয়ে গেছে রে!

এ গলা চেনে অভিজিৎ। শীলা ছাড়া আর কেউ নয়।

হঠাৎ ল্যাম্পের কাছে এগিয়ে গিয়ে নিজের হাতে আলো নিভিয়ে দিল রোশনারা।

পায়ে পায়ে আবার ফিরে এল নিজের জায়গায়।

ঘরের মধ্যে সূচীভেদ্য অন্ধকার।

অন্ধকারের মধ্যে ডুবে গেছে অভিজিৎ।

কাঁধের ওপর হাত রেখেছিল অভিজিৎ। এখনো সির্‌সির্‌ করছে জায়গাটা।

মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে ও।

হিন্দুদের বিয়ে এর আগেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে রোশনারা। এই রকম পরিস্থিতির সম্ভাবনার কথা চিন্তা করেছে রোশনারা। ভাবেনি শুধু শীলাদের মত মেয়েদের কথা।

গোছা গোছা রজনীগন্ধা রেখে গেছে বিছানায়।

রজনীগন্ধার স্টিকে হাত দিতে গিয়ে রোশনারার হাত ঠেকে যায় পাশের বালিশে।

ঠিক যেন বিদ্যুৎ খেলে যায় রোশনারার সর্বাঙ্গে।

অভিজিতের বালিশ।

অভিজিৎ অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিশ্চয়ই ভাবছে এ কোন্ আপদে পড়লাম!

আচ্ছা, অভিজিৎ যদি সত্যিই এসে শুয়ে পড়ে ওর পাশে!

কিন্তু রোশনারা জানে বিশ্বাসের অমর্যাদা করতে পারে না

অভিজিৎ। কিছুতেই বিছানায় এসে শুতে পারে না সে।

অনেকগুলো বোবা মুহূর্ত কেটে যায়।

শীলাদের উপস্থিতি টের পাচ্ছে না রোশনারা। অপেক্ষা করে করে নিশ্চয়ই ওরা ফিরে গেছে এতক্ষণ।

রোশন!

অভিজিৎ বিছানার কাছে সরে এসেছে।

কি?

তুমি নির্ভয়ে ঘুমাতে পারো, রোশন। আমি বালিশ নিয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়ছি।

বিছানা!

কোন প্রয়োজন হবে না, রোশন।

বালিশ নিয়ে চলে যাবার পরেও আরো অনেকক্ষণ জেগে থাকে রোশনারা। অপরিচিত জায়গা, বিচিত্র পরিবেশ, অভিজিতের একই ঘরে উপস্থিতি—সব মিলিয়ে কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না চোখের পাতায়।

বাবাও নিশ্চয়ই বিছানায় শুয়ে শুয়ে রোশনের কথাই ভাবছেন।

মা চোখের জল ফেলছেন লুকিয়ে লুকিয়ে।

অভিজিতের কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। কি ভাবছে সে, কে জানে!

অনেক ত্যাগ স্বীকার করছে অভিজিৎ। যদি কোনদিন সময় আসে, সুযোগ হয়, প্রতিদান দেবার চেষ্টা করবে রোশনারা।

অভিজিৎ শুয়ে শুয়ে রোশনারার কথাই ভাবছিল।

ওর সমস্ত চিন্তাই যেন রোশনারাকে ঘিরে।

এসব একদিন প্রকাশ হয়ে পড়বেই। সে দিন মায়ের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না। বাবার কড়া মেজাজের সম্মুখীন হতে হবে। বন্ধু-বান্ধব পরিহাস করবে। সব মেনে নিতে, সহ্য করতে পারবে রোশনারার জন্যে।

সব সহ্য করবে অভিজিৎ। তবু রোশনারা নিরাপদে থাক। নিশ্চিন্তে থাক।

পরের দিন খুব সকালে ঘুম ভাঙলে তাড়াতাড়ি উঠে অভিজিৎ দেখতে পেলো কনুইয়ে ভর দিয়ে রোশনারা ওর দিকেই তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টিতে।

রোশনারার চোখে সেই অপরিচিত ভাষা, মাঝে মাঝে যা দেখে অবাক হয় অভিজিৎ।

রাত্রে ঘুম হয়েছিল তো ?

অভিজিৎ ম্লান হাসে।

এ প্রশ্ন আমার করা উচিৎ, অভিজিৎ।

কেন ?

অভিজিৎ মুখের ওপর হাসিটাকে ধরে রাখতে চেষ্টা করে।

মাটিতে আমি শুইনি।

রোশনারার চোখে তেমনি দৃষ্টি।

আমার কোন অসুবিধা হয়নি।

না হলেই ভাল।

রোশনারা হাত দিয়ে বালিশ ঠিক করতে থাকে।

অভিজিৎ নিজের বালিশ দুটো পাশাপাশি রেখে দেয়।

শোন রোশনারা, এখুনি আমি একবার ঢাকায় যাবো।

ঢাকায় !

রোশনারা বিস্মিত হয়।

কবে ফিরবে ?

দুই একদিন দেরী হতে পারে।

ওঃ।

চুপ করে যায় রোশনারা।

তোমার কোন অসুবিধা হবে না রোশনারা।

আমি জানি অভিজিৎ তুমি আমার অসুবিধা হয় এমন কাজ করবে না।

ধন্যবাদ।

আবার হাসতে থাকে অভিজিৎ।

কিন্তু আজ না গেলেই কি নয়?

না রোশনারা। একবার যেতেই হবে।

বাড়ীর সকলে, বিশেষ করে মা কি ভাববেন?

আমি ওদের বুঝিয়ে যেতে পারবো।

কি এমন কাজ?

শাড়ীটা ঠিক করে নিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়ল রোশনারা।

নিজের কিছু কাজ আছে। তা ছাড়া ঢাকায় আমার উপস্থিতিতে এই কথাই প্রমাণ করবে, আর যেখানেই তুমি যাও আমার সঙ্গে যোগাযোগ নেই।

তুমি এখান থেকে পালিয়ে যেতে চাইছো অভিজিৎ?

তুমি বিশ্বাস করো রোশনারা, আমি যাবো আর আসবো। খুব বেশী দেরী হলে তিন দিন।

তুমি আমাকে ভয় পেয়েছো অভিজিৎ।

তর্কে আমি হেরে যাবো রোশনারা।

আচ্ছা, তুমি যেতে পারো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো রোশনারা।

বাইরে মায়ের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

ঢাকায় যাবার কথা অভিজিৎ মায়ের কাছে বলতে মাও যেন অসন্তুষ্ট হলেন।

তোর মতি-গতি আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, অভি।

তুমি বুঝতে পারছো না, মা। খুব বেশী দরকার না থাকলে এই সময় কেউ যায়?

মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়ে মা-ছেলের কথার মাঝে রোশনারা গিয়ে উপস্থিত হল।

ওকে যেতে দিন, মা।

বৌমা তুমিও যেতে বলছ? কি জানি বাপু, কি তোমাদের ব্যাপার-স্যাপার!

ভবতারিণী হনহন করে প্রস্থান করেন।

অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে রোশনারা।

শীলা ওঠার আগেই যেতে হবে। হতভাগিনী উঠলে জ্বালিয়ে একশেষ করবে।

ডিস্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তা ধরে দুপুরের আগেই অভিজিৎ ঢাকায় এসে উপস্থিত হল।

মিলিটারী শাসন পাকাপোক্তভাবে কায়েম হয়েছে।

সামরিক কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত কঠোরভাবে রাশ টেনে ধরে অসংযত মানুষের।

দু'দিনে শহরের চেহারাই পাল্টে গেছে।

দোকান-পাট সব খোলা, রাস্তায় মানুষের অভাব নেই।

গাড়ী-ঘোড়াও আগের মতই চোখে পড়ল।

ঢাকায় এসে অতিরিক্ত যা চোখে পড়ল, তা হল অসংখ্য মিলিটারী গাড়ি। আর গাড়ী-বোঝাই সৈন্য বাহিনী।

দুটোর সময় জিন্নৎ মহলে এলো অভিজিৎ।

বিশ্ববিদ্যালয় এখনো খোলেনি। কিন্তু জিন্নৎ মহলে ছাত্রের অভাব নেই।

জিন্নৎ মহলে এসে অনুমান করা সম্ভব নয় আজ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ।

হলের সব ক'টা টেবিলই যথারীতি ছাত্রদের দখলে।

একটু কান পাততেই অভিজিৎ বুঝতে পারলো ছাত্রদের আলোচনার প্রসঙ্গ পাল্টেছে। আগে রাজনীতি ভিন্ন অন্য কোন আলোচনাই এখানে স্থান পেতো না। আজ অধিকাংশ টেবিলেই বিভিন্ন বিষয়বস্তু পাল্টেছে। কোথাও সাহিত্য, কোথাও সিনেমা, কোথাও খেলাধূলা নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে।

সামাদ মিঞা কাউণ্টারে বসে কি একটা কাগজ পড়ছে।

সামাদ মিঞার কাউণ্টারের কাছে এগিয়ে গেল অভিজিৎ।

একমনে কাগজে মনোনিবেশ করেছিলো সামাদ মিঞা।

সামাদ মিঞা!

সামাদ মিঞা হয়ত শুনতে পায়নি, তাই উত্তর দিল না।

সামাদ মিঞা!

আর একবার ডাকলো অভিজিৎ।

এবার মুখ তুললো সামাদ মিঞা।

অভিজিৎকে দেখতে পেয়ে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, আপনি?

এই ক'দিন আসতে পারিনি। তা আর সবায়ের খবর কি?

একমাত্র রোশনারা চৌধুরী ছাড়া আর সকলেই আসেন। এখনো পাবেন হয়তো কাউকে।

চারিদিকে একবার সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ঈষৎ চাপা কণ্ঠে সামাদ মিঞা বলল, মিলিটারী তালাশ করে বেড়াচ্ছে মিস চৌধুরীকে। রাত বারোটার সময় একদিন আমার বাড়ী গিয়ে হাজির। সে কি জেরা! আমি যত বলি কিছুই জানি না, ততই প্রশ্ন করতে থাকে।

আজ দুপুরেও লোক ঘুরে গেছে।

হলের চারিদিকে আর একবার সতর্ক দৃষ্টিতে তাকায় সামাদ মিঞা।

ঐ যে পূব-দিকের কোণের টেবিলটা, ঐ টেবিলে অনেকক্ষণ বসেছিল এসে। যতই বেশ বদলে আসুক, এই সামাদ মিঞার চোখ ফাঁকি দিতে পারেনি।

সামাদ মিঞার দৃষ্টি অনুসরণ করে অভিজিৎও তাকায় হলের দিকে।

আচ্ছা, আমি কেবিনের দিকে যাই, সামাদ মিঞা। আপনি

বরং কাউকে ডেকে কফি পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। এখানে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করা ঠিক হবে না।

হারুন আর লায়লী বসে বসে কফির পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছিল।

অভিজিৎ ভেতরে ঢুকে পড়ল।

অভিজিৎ, তুমি? রোশনারা কোথায়?

শরীরটা ভাল ছিল না, হারুন।

মিলিটারী হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে রোশনারাকে।

তাই নাকি!

অভিজিৎ যেন কিছুই জানে না, এমন ভাব করল।

তা, রোশনারা ধরা পড়েনি তো?

ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে বাড়ীতেও নেই রোশনারা। মিলিটারী ওর বাড়ী পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল।

সুলতান চৌধুরী কোথায়?

তারো কোন খোঁজ-খবর নেই, অভিজিৎ। তুমি, রোশনারা, সুলতান—সব একসাথে উধাও হয়ে গেলে। এদিকে আমরা ভেবে মরি।

মনে মনে চিন্তিত হল অভিজিৎ।

সুলতান চৌধুরীকে খুঁজে বের করতেই হবে।

বেয়ারা কফির পেয়ালা নিয়ে এসেছিল।

কফির পেয়ালায় বেশ বড় রকমের একটা চুমুক দিল অভিজিৎ।

বিশ্ববিদ্যালয় কবে খুলছে?

শুনছি দু'তিন দিনের মধ্যেই খুলবে।

দুটো দিন শুয়ে শুয়েই কেটে গেল।

অভিজিৎ কাপে চুমুক দিয়ে সন্ধানী দৃষ্টিতে দু'জনের চোখের দিকে তাকায়।

লায়লী এতক্ষণ কোন কথা বলেনি।

দু'জনের কথার মাঝে নির্বাক শ্রোতার মত বসেছিল।

এবার লায়লী মুখ খুললো : বড় বড় নেতারা সকলেই নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছেন, সবাই পরিস্থিতির ওপর লক্ষ্য রাখছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস রোশনারাও নিশ্চয়ই কোথাও সেন্টার নিয়েছে।

কফির পেয়ালা শূন্য হয়ে গিয়েছিল।

সামনের দিকে পেয়ালাটা একটু ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো অভিজিৎ।

এদের কাছে অতিরিক্ত আর কিছু জানবার নেই।

সুলতানের সাথে দেখা হলে দিন কয়েকের জন্যে ভাল ছেলের মত কাকীমার আঁচলের তলায় আশ্রয় নেবে।

অভিজিৎ, তুমি এখনই উঠছো ?

চলি হারুন, চলি লায়লী, শরীরটা আবার খারাপ লাগছে।

ওদের আর কোন কথা বলার অবসর না দিয়ে অভিজিৎ বেরিয়ে এল।

রোশনারা আপাতত নিরাপদ।

রোশনারার কথা মনে পড়তে কালকের ভয়ানক রাত্রিটার কথা মনে পড়ল।

রোশনারার চিন্তা সারাক্ষণের জন্যে ওকে তাড়া করে ফিরেছে।

আগুনের সঙ্গে খেলায় মেতেছে অভিজিৎ।

ক্ষণিকের দুর্বলতাও যদি তার মনকে স্পর্শ করে সারা জীবন তাকে জ্বলতে হবে।

রোশনারা বাগদত্তা।

সুলতানের সঙ্গে বিয়ের কথা পাকা হয়ে আছে।

রোশনারা সুলতানকেই মনে-প্রাণে স্বামী বলে জানে।

কাল সারারাত গায়ের মাংস কামড়ে ধরে নিজেকে সংযত করেছে অভিজিৎ।

ধৈর্যেরও একটা সীমা আছে।

অভিজিৎ তাই আজ সকালে উঠেই রোশনারার কাছ থেকে

পালিয়ে এসেছে। ভাগ্য সুপ্রসন্নই বলতে হবে।

জিন্নৎ মহলের গেটের সামনেই সুলতান চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

সুলতানও জিন্নৎ মহলেই আসছিল!

সামনে অভিজিৎকে দেখে থমকে দাঁড়ালো সুলতান।

রোশনারা?

ভয় নেই সুলতান, রোশনারার যদি কোন বিপদ আসে, সে-বিপদ অভিজিৎ রায়কেও স্পর্শ করবে। সুতরাং আমার দিকে তাকিয়ে তুমি রোশনারা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারো।

তবু সুলতান চৌধুরী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় অভিজিতের মুখের দিকে।

সুলতান চৌধুরী একটু একটু করে অসহ্য হয়ে উঠছে অভিজিতের কাছে।

রোশনারা-সম্বন্ধে এতো ভয় কেন সুলতানের? ভাঙন ধরলে তবেই ভয়-দুশ্চিন্তা আসে মনে। তবে কি সুলতান আর রোশনারার মধ্যে কোথাও চিড় খেয়েছে?

একবার অভিজিতের ইচ্ছে হল স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করতে সুলতানকে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করে নেয়।

এ সময় কোন রকম গোলমাল হলে তার বিপদ রোশনারাকেও স্পর্শ করতে পারে। তাতে পূর্ব বাংলায় যে নতুন নেতৃত্বের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে রোশনারাকে ঘিরে, তার ভিত্তিতেও ফাটল দেখা দেবে।

তবে সময় ও সুযোগ পেলে সুলতানের ধমকানির উত্তর অবশ্যই দেবে সে।

তুমি ফিরে এলে যে?

সুলতান চৌধুরী কাছে সরে আসে অভিজিতের।

সহরের আবহাওয়া জানা প্রয়োজন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল অভিজিৎ।

রোশনারাকে গ্রেপ্তারের জন্যে চারিদিকে লোক ছুটেছে। আতাউর রহমান নামে একজন দক্ষ গোয়েন্দার ওপর ভার পড়েছে ওকে খু জে বের করার জন্যে। লোকটা আফাক চৌধুরীর কাছে গিয়ে হাজির হয়েছিল।

শহরের অবস্থা ?

থমথমে ভাব। ঝড় যে আবার কখন উঠবে ঠিক নেই। ছাত্ররা নতুন কর্তাদের ওয়াচ করতে ব্যস্ত।

একটা সিগারেট ধরিয়ে স্থলতান বলল, ভেতরে যাবে না ?

শরীর ভাল নেই, স্থলতান।

তাহলে ?

আজ রাত্রেই আবার ফিরে যেতে হবে। আচ্ছা, চলি স্থলতান।

স্থলতানের কাছে যতটুকু সংবাদ নেবার নিয়ে ফেলেছে। স্থলতানেরও আর প্রয়োজন নেই।

রাস্তায় নেমে পড়ে অভিজিৎ।

নবাবপুর রোড আবার স্থন্দর ও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

রাস্তায় রাস্তায় আগের মতই লোকজন গাড়ি-ঘোড়া।

শুধু হাসি নেই মানুষের মুখে।

কোন মন্ত্র-বলে যেন স্বল্পবাক হয়ে গেছে শহরের সমস্ত মানুষ।

ক্লান্তিতে শরীর সত্যিই ভেঙে পড়ছিল অভিজিতের।

কাল সারারাত ঘুম হয়নি।

মনের ওপর দিয়ে চিন্তার রোলার চলেছে গত দু'দিন।

সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

অভিজিৎ ক্লান্ত।

ব্রিগেডিয়ার ওসমান অত্যন্ত গম্ভীর মুখে বসেছিলেন।

সামনে একটা ফাইল খোলা।

তিনি ঘন ঘন দরজার দিকে চাইছিলেন।

ছাইদানীর ওপরে অর্ধদগ্ধ একটা সিগারেট পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

অপদার্থ!

আপন মনেই একবার উচ্চারণ করলেন ব্রিগেডিয়ার ওসমান।

রোশনারার ফাইলে আর একটা লাইনও নতুন করে সংযোজিত হয়নি।

দুটো বাজে। অথচ আতাউর রহমানের দেখা নেই।

সেই সকাল আটটায় জীপ নিয়ে বেরিয়েছে লোকটা।

আরো আধ ঘণ্টা পরে প্রায় আড়াইটের সময় ঘর্মাক্ত কলেবরে আতাউর রহমান ব্রিগেডিয়ার ওসমানের ঘরে প্রবেশ করলেন।

আপনার প্রোগ্রেস-রিপোর্ট দিন, রহমান সাহেব।

টেবিলের ওপর খুলে রাখা কলমটা তুলে নিলেন ব্রিগেডিয়ার ওসমান।

পাণ্ডু বর্ণ ধারণ করল আতাউর রহমানের মুখ।

রোশনারা চৌধুরী ঢাকা শহরে নেই, এইটুকুই বলতে পারি স্যার। এর বেশী আর কিছুই আমার বলার নেই।

আজ ক'দিন ধরে একটা মেয়েকে আপনি সমস্ত ডিপার্টমেণ্টের সাহায্য নিয়েও খুঁজে বের করতে পারলেন না। এতে কি আপনার অযোগ্যতাই প্রমাণ হয় না?

মুখ থেকে নেমে যাওয়া সমস্ত রক্ত আবার মুখমণ্ডলে এসে পড়ল।

আতাউর রহমান মাথা নীচু করে বসে রইলেন চেয়ারে।

দেখুন মিঃ রহমান, আপনাকে আরো দু'দিন সময় দেওয়া হচ্ছে। এই দু'দিনের মধ্যে যেখান থেকে পারেন মেয়েটার খবর নিয়ে আসুন। আর যদি তা না পারেন পদত্যাগ-পত্র দাখিল করুন।

জ্বলন্ত সিগারেটটা তুলে নিলেন ব্রিগেডিয়ার ওসমান।

আতাউর রহমান একবার মুখ তুললেন মাত্র।

ডিপার্টমেণ্টে আপনার সুনাম শুনেই এই কাজের ভার দিয়েছিলাম, মিঃ রহমান। অতীতের রেকর্ডও আপনার সুনামের সাক্ষী। আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না, একটা মেয়েকে কেন আপনি খুঁজে বের করতে পারছেন না!

মেয়ে বলেই প্রধান অসুবিধা, স্যার। তাছাড়া আরো একটা অসুবিধা মিস চৌধুরীর ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে যা, অন্য কোন ক্ষেত্রে দেখা দেয় না।

কি রকম?

ব্রিগেডিয়ার ওসমান জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

মিস চৌধুরীর নাম কোন গুণ্ডা বদমায়েসের খাতায় লেখা নেই, স্যার। গুণ্ডাদের পলায়নের এক একটা পথ আছে। তেমন কোন পথ ধরে আমরা অগ্রসর হতে পারছি না। কারণ অতীতের কোন রেকর্ড নেই।

একটু থেমে আতাউর রহমান আবার বললেন, রাজনীতির ক্ষেত্রেও মিস চৌধুরী নতুন। এক্ষেত্রেও তার পূর্ব-অনুসৃত কোন পথের সন্ধান আমাদের নেই।

রাইট।

ব্রিগেডিয়ার বললেন, মেনে নিলাম আপনার কথা, মিঃ রহমান। কিন্তু সবশেষে এইটাই কি সত্য নয় যে, মিস চৌধুরী একজন মহিলা? তাকে খুঁজে বের করতে না পারা আপনার আমার সকলের কলংক। এ কলংক সমস্ত পুরুষ-সমাজের।

বেশ, ঢাকায় যদি নাই থাকেন ঢাকার বাইরের খবর নিন।

ঠিক আছে, স্যার। আমাকে আর একদিনের সময় দিন। এর মধ্যে যদি আমি সফল না হতে পারি নিজে এসে আপনার কাছে পদত্যাগ-পত্র দাখিল করে যাবো।

চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নেই, মিঃ রহমান। চেষ্টা করুন, আপনিও পারবেন। এক পথে সফল হতে না পারেন অন্য পথ ধরুন।

সেপথেও বিফলতা এলে তৃতীয় পথে আপনি নিশ্চয়ই সফল হবেন। সমস্ত ডিপার্টমেণ্ট আপনার পেছনে রয়েছে।

এখন তাহলে উঠি, স্যার?

আসুন।

রোশনারা চৌধুরীর ফাইল ড্রয়ারে তুলে রাখলেন ব্রিগেডিয়ার ওসমান।

আতাউর রহমান অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

আতাউর রহমানের মুখের রক্ত মুখেই রয়ে গেছে।

জীবনে তার মুখের ওপর এমন করে আর কেউ অপমানসূচক কথা বলতে পারেনি। তিনি যেখান থকে যে ভাবে পারেন রোশনারা চৌধুরীকে খুঁজে বের করে এনে অপমানের উত্তর একদিন দেবেন ব্রিগেডিয়ার ওসমানের মুখের ওপর।

অফিস-কক্ষে এসে নিজের চেয়ারে বসলেন আতাউর রহমান।

গোটা দুনিয়া এমনই নিমকহারাম। অতীতের শত কৃতিত্ব একটি মাত্র অসাফল্যের ধাক্কায় কোথায় তলিয়ে গেছে।

আতাউর রহমান অপদার্থ, এইটাই আজ সব চাইতে বড় হয়ে উঠেছে।

চেয়ারের পিঠে ঠেস দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে চোখ বোঁজেন মিঃ রহমান।

শহর যদিও থমথমে কিন্তু পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। এমন কোন স্থান নেই শহরে, যেখানে তিনি মিস চৌধুরীকে খুঁজতে বাকী রেখেছেন। ভানুমতীর খেলের মত অদৃশ্য হয়ে গেল মেয়েটা!

হয় অপসারণ অথবা কৃতিত্ব।

আর তা আগামী কালের মধ্যেই।

জোরে জোরে সিগারেট টানতে থাকেন আতাউর রহমান।

ওসমান!

আজ্ঞে।

সহকারী ওসমান খাঁ তার টেবিলে বসে কাগজে কি সব লিখছিল আর মাঝে মাঝে বাঁকা-চোখে আতাউর রহমানের মুখের ভাষা বোঝবার চেষ্টা করছিল।

কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল মেয়েটা বলতে পারো, ওসমান ?

ওসমানের কাছেও ঐ একটি মাত্রই সমস্যা। আতাউর রহমানের দক্ষতার কথা তার চাইতে আর কারো বেশী জানবার কথা নয়। অথচ এই ক্ষেত্রে রহমান সাহেবও এক পা-ও অগ্রসর হতে পারছেন না।

ছেলে-ছোকরাদের কাণ্ডই স্যার আলাদা।

আজ সন্ধ্যে বেলা তৈরী থাকবে, ওসমান।

আচ্ছা, স্যার।

শহরে শেষবারের মত একবার চেষ্টা করে দেখবো। যদি সেখানেও কোন হদিশ না পাওয়া যায়, আমাদের প্রোগ্রাম ঢেলে সাজাতে হবে।

আবার চোখ বুজলেন আতাউর রহমান।

বয়স হচ্ছে তাঁর।

তিনি পিছিয়ে পড়ছেন আর যুগের হাওয়া পাল্টাচ্ছে।

হয়ত ঠিকই বলেছেন ব্রিগেডিয়ার ওসমান।

দিন দিন অপদার্থ হয়ে পড়েছেন আতাউর রহমান।

শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন নেতাকে স্বগৃহে অন্তরীণের নির্দেশ এসেছে। তাঁদের প্রত্যেকের বর্তমান উপস্থিতি ও দৈনন্দিন সীমাবদ্ধ কাজের বিবরণ সরকারের নখ-দর্পণে।

একমাত্র ব্যতিক্রম ঐ রোশনারা চৌধুরী।

সরকার মেয়েটাকে গ্রেপ্তার করতে চান।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন আতাউর রহমান।

অফিসেই আজকের আহার সারবেন।

এক সেট জামা-কাপড় সর্বদাই অফিসে মজুত রাখেন তিনি।

অফিসেই স্নানাহার সেরে একবার শেষ-চেষ্টার জন্যে বেরোবেন।

যদি ব্যর্থ হন আগামী কাল মাত্র হাতে সময়।

আমি যাচ্ছি, ওসমান। সব যেন তৈরী থাকে।

নিশ্চিন্তে যান, স্যার। সব তৈরী থাকবে।

অফিস-কক্ষ ছেড়ে ক্যাটারিংয়ের দিকে এগিয়ে চললেন আতাউর রহমান।

সন্ধ্যে সাতটার সময় আতাউর রহমান ওসমান ও দু'জন সশস্ত্র সৈন্যের সঙ্গে যে বাড়ীর সামনে এসে থামলেন, সে-বাড়ীর বর্তমান বাসিন্দা জে. বি.।

পূর্ব-বাংলার অন্যতম বৈজ্ঞানিক জয়ন্ত বোস।

বাড়ীর সামনে অনেকগুলো লোককে জটলা করতে দেখা গেল।

মিলিটারী গাড়ী দেখে ভীড় সরে গেলেও দূরে দূরে অনেকেই দাঁড়িয়ে রইল।

কাছাকাছি একজনকে ডাকতে সে জানালো, এই বাড়ীর একাংশে স্বামী-স্ত্রী বাস করছিলেন কিছুদিন ধরে।

স্বামীকে কেউ কোনদিন বাড়ীর বাইরে বের হতে দেখেনি।

বৌটি শুধু মাঝে মাঝে রাস্তার কল থেকে জল নিয়ে যেতো। তাও প্রতিদিন নয়। আজ বিকেলের দিকে ঘরের মধ্যে থেকে দুর্গন্ধ বের হতে সুরু করলে প্রতিবেশী কয়েকজন ডাকতে গিয়ে কোন সাড়া শব্দ পায়নি। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

দুর্গন্ধও বেড়েই চলেছে।

বিস্মিত হলেন আতাউর রহমান।

প্রোফেসার জে. বি-র কাছেই তিনি এসেছিলেন।

খবর পেয়েছিলেন রোশনারা মাঝে মাঝে জে. বি-র সঙ্গে দেখা করতে আসতো। যতবারই এসেছে, সন্ধ্যের দিকেই দেখা গেছে রোশনারাকে।

জে. বি-কে না পেলে রোশনারাকে খুঁজে পাবার শেষ যোগসূত্র-টুকুও হারিয়ে যাবে।

বাধ্য হয়েই নিজের সম্মান রাখার জন্যেও পদত্যাগ-পত্রই পেশ করতে হবে তাঁকে। ওসমানকে অনুসরণ করতে ইসারা করে আতাউর রহমান জে. বি-র দরজার কাছে এগিয়ে গেলেন।

প্রতিবেশীদের মধ্যে যারা দূরে সরে গিয়েছিল, একে একে তারাও এসে চারিদিকে ভীড় করে দাঁড়ালো।

পকেট থেকে রুমাল বের করলেন আতাউর রহমান সাহেব।

দুর্গন্ধে টেকা দায়।

জে. বি-র পাশের ঘরে থাকেন সুরঞ্জন সরকার নামে এক ভদ্রলোক।

স্ত্রী-পুত্র মিলে সাতজনের সংসার।

সরকার মশাই বেরিয়ে এসে আতাউর রহমানকে বললেন, আজ দু'দিন ধরে ঘরে টেকা দায় হয়ে পড়েছে। স্বাস্থ্য-দপ্তরে সংবাদ দিয়েছিলাম। তাদেরই কোন খবর নেই। একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে যান স্যার, এসেছেন যখন। নইলে আজ রাত্রে আর টেকা যাবে না।

রুমালে মুখ মুছলেন আতাউর রহমান।

সরকার মশাই আবার বললেন, আমার যতদূর মনে হয় স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই ঘরের মধ্যে মরে পড়ে আছে। হয় কেউ খুন করে গেছে অথবা দু'জনে যুক্তি করে আত্মহত্যা করেছে।

দরজায় বুট দিয়ে বার তিনেক লাথি মেরে ক্ষান্ত হলেন আতাউর রহমান।

ওসমানকে বললেন, দরজা ভেঙে ফেল, ওসমান।

ওসমান গতরে-সতরে।

বার দুয়েক নিজের কলেবর দরজার ওপরে নিয়ে গিয়ে ফেলতেই ভেতরের খিল শব্দ করে ভেঙে গেল।

দরজার পাল্লা খুলতেই প্রাণান্তকর গন্ধ সকলকে অতিষ্ঠ করে তুললো।

প্রায় সকলেই যে যা পারলো নাকে চাপা দিল।

ঘরের ভেতরে ঘুরঘুটি অন্ধকার।

কোন কিছু দেখার উপায় নেই।

একটা লণ্ঠন আনতে পারবেন ?

এনে দিচ্ছি, স্যার।

মিনিট দুয়েকের মধ্যেই লণ্ঠন নিয়ে ফিরে এলেন বিশ্বাস মশাই।

আতাউর রহমানের পকেটে টর্চ ছিল কিন্তু ইচ্ছে করেই তিনি টর্চ বের করেননি।

লণ্ঠন হাতে আতাউর রহমানই সকলের আগে ঢুকলেন ঘরের মধ্যে। ডান হাত দিয়ে নাকের ওপর রুমাল 'চেপে ধরা।

ঢুকেই আতাউর রহমানকে থমকে দাঁড়াতে হল।

ঘরের মধ্যে ঠিক দরজার সামনেই একজন ভদ্রলোক কড়িকাঠের সঙ্গে দড়ি বেঁধে ঝুলছে।

প্রফেসার জে. বি !

বিস্ময়সূচক কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন আতাউর রহমান সাহেব।

অদূরে বিছানার ওপরে এক ভদ্র মহিলা হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছেন।

প্রচণ্ড দুর্গন্ধ ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে ঘরের মধ্যে।

উভয়কেই মৃত বলে মনে হল আতাউর রহমানের।

ওসমান !

স্যার ?

ঢাকার আশা আমাদের ছাড়তেই হল।

ঘরের ঝুলন্ত পুরুষের দিকে তাকালেন।

প্রফেসার জে. বি. নিজের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আতাউর রহমানের আশাকেও গলায় দড়ি দিয়ে খুন করে গেছেন।

প্রতিবেশীদের কয়েকজন ঘরের মধ্যে ঢুকতে চেষ্টা করছিল।

এক ধমক দিলেন আতাউর রহমান।

ষ্টেনগান উঁচিয়ে দরজার সামনে পথ অবরোধ করে এসে দাঁড়ালো দু'জন সৈনিক।

মিস রোশনারা চৌধুরী মাসে অন্তত একবার এখানে আসতেন, এ সংবাদ তিনি পেয়েছেন।

ঘরের জিনিষ-পত্র যথাস্থানে রাখা আছে।

কোন জিনিষই স্থানচ্যুত অবস্থায় লক্ষ্য পড়ল না।

স্থানচ্যুত হয়েছে শুধু ঘরের মানুষ দু'জন।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিছানায় মহিলার দিকে তাকালেন।

মহিলার বেশবাস অবিন্যস্ত দেখে বিস্মিত হলেন আতাউর রহমান।

পকেট থেকে টর্চ বের করে মহিলার মুখের ওপর ফেললেন।

মহিলা সুন্দরী সন্দেহ নেই।

কিন্তু দেহ পচতে স্বুরু করায় মুখের স্থানে স্থানে ফুলে উঠেছে।

দেহের কোথাও কোন আঘাতের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না।

ওসমানের দিকে ফিরে আতাউর রহমান বললেন, কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে থানায় ফোন করে দাও, ওসমান। কারণ থানা থেকে লোক আসার আগে স্থান ত্যাগ করা আমাদের ঠিক হবে না।

ওসমান থানায় ফোন করতে বেরিয়ে গেল।

স্বল্প জিনিষ-পত্রের ওপর টর্চের আলো ফেলে চললেন।

চারিদিকে বইয়ের ছড়াছড়ি।

বিজ্ঞানের নামী প্রফেসার, বই না থাকাটাই অস্বাভাবিক।

ঘরের কোণের টেবিলে একখানা ডায়েরী নজরে পড়ল।

ডায়েরীখানা পকেটে করে নিলেন আতাউর রহমান।

রোশনারার কোন রেফারেন্স পাওয়া অসম্ভব নয়।

বাইরে বেশ কোলাহল স্বুরু হয়ে গেছে।

ঘরের মধ্যে টেকা ক্রমশই অসহ্য হয়ে উঠছে।

ঘরের বাইরে এসে নিজের হাতে শেকল টেনে দিলেন আতাউর রহমান।

মিনিট দশেকের মধ্যে ওসমান ফিরে এলো।

থানা থেকে এক্ষুণি লোক এসে পড়বে, স্যার।

বিশ্বাস মশাই আতাউর রহমানকে দেখে এগিয়ে এলেন।

কিছু অনুমান করতে পারছেন, স্যার?

খুব সম্ভব আত্মহত্যা।

বড় রাস্তায় এক সঙ্গে কয়েকখানা গাড়ীর শব্দ পাওয়া গেল।

মিলিটারী কনভয় চলেছে।

বিশ্বাস মশাইয়ের দিকে ফিরে আতাউর রহমান বললেন, অনেক সময় দেখা যায় কোন বিশেষ কারণে, বেশীর ভাগ সময় অভাবের তাড়নাতেই গোটা পরিবার এক সাথে আত্মহত্যা করেছে।

রাত এগারোটার সময় অনেকগুলো দুশ্চিন্তা মাথায় করে বাসায় ফিরলেন আতাউর রহমান।

দুশ্চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে বিগ্রেডিয়ার ওসমানের চেহারাটা বার বার উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। গৃহিণী টিপার কিন্তু দুশ্চিন্তার অবসান হল অন্তত একটা রাত্রির মত।

স্বামী যে কাজ করেন, তাতে ঘর থেকে বেরোলেই টিপারও সমস্ত কাজ-কর্ম বন্ধ হয়ে যায়।

আজ এতো দেরী হল যে!

ঠিক সঙ্গে সঙ্গে আতাউর রহমান সাহেব উত্তর দিতে পারলেন না।

মাথার ভেতরটা আদমজী কোম্পানীর কারখানার ফার্নেস হয়ে উঠেছে।

খানিকটা তেল দাও টিপা, কলের তলায় মাথা পেতে ঘণ্টা দেড়-ঘণ্টা বসে না থাকলে আর রেহাই নেই।

গৃহিণী হাতের তালুতে তেল ঢালতেই হাতখানা মাথায় থাবড়াতে থাবড়াতে কলঘরের দিকে ছুটলেন আতাউর রহমান সাহেব।

প্রায় ঘণ্টা খানেক বসে থাকবার পর যখন মনের মধ্যে ব্রিগেডিয়ার সাহেব উঁকি মারা কমিয়ে দিলেন, তখন উঠে পড়লেন কলতলা থেকে।

মাথা মুছতে মুছতে ক্ষিধের কথা মনে পড়ল।

খাবার টেবিলে বসে আতাউর রহমান সাহেব গো-গ্রাস নয়; একেবারে হস্তী-গ্রাস মুখে তুলতে সুরু করলেন।

টিপা পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন।

খেয়ে-দেয়ে আবার কোথাও বেরোবে নাকি?

আজ্ঞে না। আজ রাত্রের মত ফুরসৎ।

আস্তে আস্তে খাচ্ছো না কেন?

তুমি আছো বলে।

এর পর আর কিছু বলে ফেলেন, এই ভয়ে টিপা অন্য ঘরে প্রস্থান করলেন। খাওয়া-দাওয়া সেরে আতাউর রহমান সাহেব পড়ার টেবিলে গিয়ে বসলেন। প্রফেসার জে. বি-র ডায়েরীখানা উল্টে-পাল্টে দেখতে হবে, যদি কোন কূল-কিনারা পাওয়া যায়।

কালকের দিন গেলেই তো আবার ব্রিগেডিয়ার ওসমান হালুম-হালুম সুরু করবেন। যদি রোশনারাকে খুঁজে বের করতে না পারেন, তিনি নিজেই কাজ ছেড়ে দেবেন। মনে মনে স্থির করে রাখেন।

তিনি ভালভাবেই জানেন, আতাউর রহমানের মত লোকের কোথাও কোন মিলে অন্তত সিকিউরিটি অফিসারের একটা কাজ মিলেই যাবে।

কাজের জন্য চিন্তা করেন না তিনি। কাজ জুটিয়ে নেবার মত ব্যবস্থা তিনি করেই রেখেছেন।

ডায়েরীখানা সুদৃশ্য।

উইথ বেস্ট কমপ্লিমেণ্টস ফ্রম সায়েন্টিফিক ইনসট্রুমেণ্টস অফ ইংল্যাণ্ড।

অত্যন্ত আকর্ষণীয় কভার।

প্রথম তিন চারখানা পাতা খুলেই আতাউর রহমান সাহেব বুঝতে পারলেন, এ ডায়েরী কোন রোজনামচা নয়।

এর পাতায় পাতায় নিজের উল্লেখযোগ্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন প্রফেসার জে. বি.।

কয়েক পাতা পড়েই বুঝতে পারলেন ডায়েরী-পাতায় অনেক মূল্যবান ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।

ভাষায়, প্রকাশ-ভঙ্গীতে, বিবরণে—সব দিক দিয়েই রয়েছে মুন্সিয়ানার ছাপ।

ডায়েরী না বলে কোন জীবনী অথবা জীবনধর্মী উপন্যাসও একে বলা যেতে পারে।

রাত একটার সময় এক জায়গায় এসে চমকে উঠলেন।

গৃহিণী অনেকক্ষণ বকর-বকর করে বিছানায় গিয়েছে।

স্ত্রীর কথায় কান দেবার মত মানুষ তিনি নন।

যদি গোসা করে, আরো তিন স্ত্রী-গ্রহণের অধিকার তিনি নিয়েছেন।

জে. বি-র হাতের লেখাও এখান থেকে কাঁপা কাঁপা অক্ষরে সুরু হয়েছে :

আজ ক'দিন ধরেই লক্ষ্য করছি, শ্রীলা মাঝে মাঝেই চমকে ওঠে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে।

তবে কি ও গোপন-মনে ভয় পায় ?

আমার মুখের কদর্য অংশের দিকে তাকিয়েই কি শ্রীলা চমকে ওঠে ?

তারপরেই এই বিচিত্র স্বপ্ন।

বাড়ীতে একা রয়েছে শ্রীলা। আমি যেন কোথায় কাজে বেরিয়েছি।

রান্না-ঘরের কাজ সেরে শ্রীলা গিয়ে ঢুকলো বাথরুমে।

কি যেন ভাবলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাথরুমের দরজায়।

তারপর একে একে দেহের সমস্ত আবরণ সরিয়ে ফেলল।

শ্রীলা সুন্দরী। সুগঠনাও।

বাথরুমের খোলা দরজার কাছে একটা ভীষণ দর্শন লোক এসে দাঁড়ালো।

লোকটার মুখখানা চেনা-চেনা মনে হল কিন্তু কে ঠিক বোঝা গেল না।

শ্রীলা লোকটার উপস্থিতি টের পেয়েও সতর্ক হবার কোন প্রয়োজন বোধ করল না।

এক ঘটি জল গায়ে ঢেলে নিয়ে ঘসে ঘসে গায়ে সাবান মেখে চলল লোকটার কামার্ত দৃষ্টির সামনেই।

দেখতে দেখতে শ্রীলার সমস্ত শরীর ফেনায় ভরে উঠলো।

শুধু ফেনা আর ফেনা! দেদার ফেনা উঠছে সাবানের।

ফেনার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে শ্রীলা।

এক সময় আর্তনাদ করে উঠলো শ্রীলা ঃ বাঁচাও, বাঁচাও।

কুৎসিত দর্শন লোকটা তৈরী হয়েই ছিল। শ্রীলার আর্তনাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাথরুমের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

ফেনার মধ্যে ততক্ষণে শ্রীলার নাক পর্যন্ত ডুবে গেছে।

দু'হাত দিয়ে পাগলের মত ফেনা চেঁছে ফেলতে সুরু করল লোকটা। কিন্তু যতো ফেনা শ্রীলার গায়ের থেকে ফেলতে থাকে, ততই আবার কোত্থেকে এসে জড়ো হয়।

শ্রীলার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে এক সময় একেবারে থেমে যায়।

লোকটা তখন দু'হাতে ফেনা সরাচ্ছে আর জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে।

আরো কিছু সময় পরে ফেনা কমতে সুরু করল।

ক্লান্ত দেহে শ্রীলাও বাথরুমের মেঝেতেই আছাড় খেয়ে পড়ল।

লোকটা শ্রীলার অনাবৃত দেহের পাশে বসে দু-হাতে অবশিষ্ট

ফেনাটুকু সরিয়ে দিতে ঝকঝক করে উঠলো শ্রীলার নিরাবরণ দেহ।

লোকটার দুটো চোখও তখন জ্বলতে সুরু করেছে।

মিনিট দুয়েক জ্বলন্ত চোখে শ্রীলার দেহের সৌন্দর্য গিলতে গিলতে হঠাৎ যেন দেহের ওপরেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

ঘুম ভেঙে গেল।

চারিদিকে চেয়ে ঘরের মধ্যে শ্রীলাকে দেখতে পেলাম না।

বিকেল চারটে বাজে।

একটু পরেই শ্রীলা ঘরের মধ্যে এলো।

দেখে বুঝতে অসুবিধা হল না এই মাত্র বাথরুম থেকে স্নান সেরে আসছে।

স্নান করে এলে যে বড় ?

শরীরটা ভাল লাগছিল না, তাই।

চুল আঁচড়াবার জন্যে চিরুণী তুলে নিল।

এ বেলায় কোন দিন স্নান করতে দেখি না কিনা, তাই জানতে চাইলাম।

সাবান মেখেছো ?

হ্যাঁ।

অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত জবাব শ্রীলার।

আমি চমকে উঠলাম।

একটা অসহ্য যন্ত্রণা দেখতে দেখতে দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

মাথায় বুকে পেটে পায়ে সর্বত্র যন্ত্রণা।

স্বপ্নের সাথে আশ্চর্য মিলে যাচ্ছে শ্রীলার স্নান করা, সাবান মাখা। কোন লোক ?

স্বপ্নের মধ্যে যে লোককে এইমাত্র দেখলাম, তেমন কোন লোক ঢুকে পড়েনি তো !

আমার দিকে পেছন ফিরেই চুল আঁচড়ালো, বিনুনী বাঁধলো। বুকের কাপড় সরিয়ে গায়ে পাউডার ঢাললো।

একটা রাত্রে আর একজন মানুষ শ্রীলাকে এনে দিয়েছে আমার ক্ষত-বিক্ষত জীবনে।

পিঠের কাপড় সরিয়ে দু'কাঁধের ওপরে পাউডার ঢাললো এবার।

হ্যারিকেনের স্বল্প আলোতেও সাদা ধবধবে দেখাচ্ছে শ্রীলার পিঠের মাংস।

রজব মুন্সীই সেই রাত্রে প্রোফেসার জয়ন্ত বোসের ভাবী জীবনের পথ নির্ধারিত করে গেছে।

রজব মুন্সীর ইঙ্গিতে একটা রাক্ষস ছুটে গিয়ে জাপটে ধরেছিল শ্রীলাকে।

অতগুলো দৃষ্টির সামনে সে-রাত্রে শ্রীলার ঐ সুন্দর দেহটাকে কুড়ে কুড়ে খেয়েছিল ইসাক।

সেই শ্রীলা আমার স্ত্রী।

অসহ্য যন্ত্রণাটা আবার সমস্ত দেহে কিলবিল করে ওঠে।

একটা উচ্ছিষ্ট মেয়ে প্রোফেসার জয়ন্ত বোসের স্ত্রী হয়ে এসেছে। এ যন্ত্রণা আমি একটি রাত্রির জন্যেও ভুলতে পারিনি।

যখনই শ্রীলাকে কাছে টেনেছি, মনে পড়েছে ইসাকের কথা।

জানি না শ্রীলাও তখন ঐ রাক্ষসটার কথাই ভেবেছে কিনা।

শ্রীলা ঘুমিয়ে পড়লে কত রাত্রি কাটিয়েছি ঘরের মধ্যে পায়চারী করে।

ওর দিকে তাকিয়ে ভেবেছি, ঐ সুন্দর দেহের সমস্ত স্বাদ নিয়েছে এক পশু।

আমার স্ত্রীর দেহে ভাগ বসিয়েছে দ্বিতীয় পুরুষ।

সহ্য হয় না।

আত্মঘাতী হতে ইচ্ছে করে।

পাউডার মাখা শেষ হলে শ্রীলা হয়ত রান্নার জোগাড়েই ভেতরের দিকে যাচ্ছিল।

ডাকতে কাছে সরে এলো।

বললাম, দরজাটা বন্ধ করে এসো।

শ্রীলা কথা বলে কম। এবারেও কোন কথা বলল না।

বড় বড় চোখে ক্ষণেকের জন্যে তাকিয়ে দরজা বন্ধ করে বিছানার পাশেই এসে দাঁড়ালো।

উঠে বসলাম।

আমার বিচার-বিবেচনা, বিবেক—সব যেন লোপ পেয়ে যাচ্ছে।

আমি যেন ক্রমশ পশুতে পরিণত হচ্ছি ঠিক ইসাকের মত।

হাত বাড়িয়ে ওর কাপড় ধরে টানতেই কোমড়ের বাঁধন খসে পড়ল।

আমি একটু আগেই জেনেছি, কোন অন্তর্বাস শ্রীলার অঙ্গে নেই।

শ্রীলা এবারেও কোন প্রতিবাদ করল না।

এবারেও তাকালো বড় বড় চোখ মেলে।

জানি না ওর চোখে-মুখে এক বোবা যন্ত্রণা দেখেছিলাম কিনা।

দূরের কোন টাওয়ারে বুঝি বারোটা বাজলো ঢং ঢং করে।

গম্ভীর মুখে মানুষ যেমন করে ঘুমিয়ে থাকে শ্রীলাও ঠিক তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে আছে বিছানার পাশে।

কলম যত জোরে চালাতে চাই, ততই থেমে যায়।

কিন্তু আজ রাত্রের মধ্যেই সব কিছু লিখে শেষ করতে হবে।

ওর সর্বাঙ্গে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম।

আমি বেশ ভাল করে বুঝতে পারছি একটা আসুরিক শক্তি আমার শরীরে প্রবেশ করেছে।

সেরাত্রেও শ্রীলার দেহ এমনি ছিল।

এই দেহ নিয়েই ইসাক কাটিয়েছিল যেন কয়েক মিনিট।

ওকে বিছানায় উঠে আসতে ইঙ্গিত করলাম।

শ্রীলা আমার কথা একটি বারের জন্যেও অমান্য করেনি। এবারো করল না।

নিঃশব্দে উঠে এলো বিছানায়।

উলঙ্গ দেহেই উঠে এলো শ্রীলা।

আমার ভেতরের পশুটা তখন ক্ষেপে উঠেছে।

ইসাকের মতই আমিও ওকে ঠেসে ধরলাম বিছানার ওপর।

শ্রীলা?

কোন উত্তর দিল না।

আবার ডাকলাম শ্রীলা?

এবারো কোন উত্তর দিল না শ্রীলা।

আমি ততোই চেপে ধরছি ওকে।

কোন বাধা দিচ্ছে না শ্রীলা।

সেদিন রাত্রে ইসাককেও বাধা দেয়নি।

সে-রাত্রে শ্রীলার চোখে-মুখে ভয় দেখেছিলাম। আজো কি ভয় পেলো ও?

একমাত্র শ্রীলাই বলতে পারে কে বড় পশু, আমি না ইসাক।

ইসাক ওর যথা সর্বস্ব লুঠে নিয়েছে। আমি দেউলে দেহ নিয়ে কি করে সুখী হবো?

আতাউর রহমান থামলেন।

ডায়েরীর পাতাতেও স্পেস রয়েছে এখানে।

ভয়ঙ্কর!

কিছুটা ফাঁকা জায়গার পর আবার লেখা সুরু হয়েছে।

শ্রীলা উত্তর দেয়নি। আর কোনদিনও উত্তর দেবে না।

মেঝে থেকে শাড়ীটা কুড়িয়ে নিয়ে একটু আগেই শ্রীলার কোমড়ে জড়িয়ে দিয়েছি।

বুক দুটো ঢেকে দিয়েছি অপর প্রান্ত দিয়ে।

ঠিক যেন ঘুমিয়ে পড়েছে শ্রীলা। আমি জানি আর কোনদিন ঘুম ভাঙবে না শ্রীলার।

একটু আগেই আলো নিয়ে গিয়ে দেখেছি দু'চোখে দু'ফোঁটা জল।

এ আমি কি করলাম!

শ্রীলা এতদিন আমার সমস্ত অত্যাচার সহ্য করে গেছে।

এই প্রথম দেখলাম শ্রীলার প্রতিবাদ।

দু'ফোঁটা চোখের জলের প্রতিবাদ।

শ্রীলা!

না, সাড়া নেই।

শ্রীলা…শ্রীলা…শ্রীলা!

সাড়া দেয় না শ্রীলা।

দু'ফোঁটা চোখের জল ছাড়া আর কোন প্রতিবাদও ও করেনি।

ডান হাতখানা কামড়ে ধরি। রক্ত পড়ে ঝর্‌ঝর্‌ করে।

শ্রীলা আর কথা বলবে না।

শ্রীলা শেষ।

এবার আমার পালা। প্রফেসার জয়ন্ত বোসের পালা।

ঐ ভয়ঙ্কর স্বপ্নটাই বুঝি কাল হল।

যাক্‌, কোন দুঃখ নেই। এমন কুৎসিত জীবন শেষ হয়ে যাক্‌, এইটাই কাম্য।

আরো একটা ট্রাজেডি দেখতে পাচ্ছি। বিখ্যাত একজন বৈজ্ঞানিক আমি। অথচ আমার ঘরে এক ফোঁটা বিষ নেই। আমাকেও সাধারণ মানুষের মত গলায় দড়ি লাগিয়ে ঝুলতে হবে।

ঠিক আছে। তাই হবে। এই জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার কোন উপায় নেই।

বিছানা বাঁধার জন্যে নারকেলের দড়ি ছিল।

দড়ি!

আর কিছুই লেখা নেই ডায়েরী-পাতায়।

আতাউর রহমান বুঝতে পারলেন, এর পরেই জয়ন্ত বোস উঠে গিয়ে গলায় দড়ি দিয়েছে।

দুটো প্রাণ শেষ হয়ে গেছে।

শেষ হয়ে গেছে তারও সমস্ত আশা।

রোশনারাকে খুঁজে পাওয়ার শেষ-আশাটুকুও ফুরিয়ে গেল।

ডায়েরীর পাতা বন্ধ করে চুপচাপ চেয়ারেই বসে রইলেন আতাউর রহমান।

আর মাত্র একটা দিন অবশিষ্ট আছে।

দু'দিকে দুই ওসমান বসে আছে।

দেখা হলেই সহকারী ওসমান বলবে, কোন চিন্তা নেই, স্যার। সময় মত সব ঠিক হয়ে যাবে।

ব্রিগেডিয়ার ওসমান তো সব সময়ের জন্যেই রক্ত চক্ষু করে আছেন। সামনে দেখলেই ধমকানি।

রাত গড়িয়েই চলে।

মসজিদে মসজিদে আজানের শব্দ থেমে গেছে।

পাখীরা কিচির-মিচির সুরু করে দিয়েছে গাছের ডালে ডালে।

বিছানাতেই শুয়ে থাকে রোশনারা।

কোল-বালিশটা আরো শক্ত করে চেপে ধরে বুকের মধ্যে।

এতো আলস্য কোন কালেই ছিল না রোশনারার।

আজ চারদিন অভিজিতের দেখা নেই। কেন যে হঠাৎ ও ঢাকায় গেল, তাও বুঝে উঠতে পারে না।

অভিজিতের মা মিনিট দশেক আগে উঠেছেন। বিছানায় শুয়ে শুয়েই টের পেয়েছেন, আজ নিশ্চয়ই ফিরে আসবে অভিজিৎ।

অভিজিতের বালিশ দুটোর দিকে তাকিয়ে রোশনারা আপন মনেই হেসে উঠলো। মেঝেয় শোয়ার ভয়েই পালিয়েছে অভিজিৎ।

অভিজিৎ যদি মেঝের বদলে বিছানায় শুতে চাইতো? তাহলে অভিজিতের বদলে রোশনারাকেই পালাতে হত।

ঢাকার কোন খবরই এই ক'দিন পায়নি রোশনারা। অভিজিৎ ফিরে এলে সমস্ত খবর নিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় যদি খুলে গিয়ে থাকে, তাহলে খুব বেশী দিন আত্মগোপন করে থাকাটা ঠিক হবে না।

সামরিক শাসন সাধারণ মানুষ কি ভাবে নিয়েছে, তাও বুঝতে পারছে না। এ বাড়ীর কেউ এখন পর্যন্ত তাকে কোন রকম সন্দেহ করতে পারেনি।

অভিজিৎকে যেতে দিয়ে ভুল করেছে রোশনারা। জোর করলে নিশ্চয়ই তাকে আটকাতে পারতো। ঢাকায় এখন অনেক রকমের বিপদ। সব চেয়ে বড় বিপদ সাম্প্রদায়িকতার উসকানি।

জনসাধারণ যদিও সরকারের বহু ব্যবহৃত এই পুরোনো ধাপ্পায় আজকাল আর ভুল করে না, তবু একেবারে অসাবধান হওয়াও ঠিক নয়। মানুষের মন বিচিত্র।

সুলতান চৌধুরীর কথা ক'টা দিনে একবার হলেও রোশনারা ভাবতো। আজ ক'দিন ধরে ওকে মনেই পড়েনি। অথচ ঐ সুলতান চৌধুরীর সঙ্গেই তার বিয়ের সব ঠিকঠাক।

একদিন সুলতান চৌধুরীকে নিজের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রঙীন কল্পনা করতো রোশনারা।

আজকাল তার অধিকাংশ সময় কাটে অভিজিতের চিন্তায়।

অভিজিৎ।

রোশনারা চৌধুরীর ঠিক এই মুহূর্তের পরিচয় সে অভিজিতের স্ত্রী।

অভিজিতের চিহ্ন ঘরের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে।

এমন কি অভিজিতের গায়ের গন্ধও পাচ্ছে ঐ বালিশ দুটোয়।

একটা মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ অভিজিতের।

বৌমা!

কি, মা?

রোশনারা তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড় ঠিক করে উঠে পড়ল।

আমার শরীরটা আজ কেমন ভাল লাগছে না, মা। বোধহয় জ্বর এসেছে। তুমি আমার বদলে আজ নারায়ণের পূজোটা করে দেবে, মা?

ভেতরে ভেতরে চমকে উঠলো রোশনারা।

পারবো না বললে মা অসন্তুষ্ট হবেন। রাজীও হতে পারে না। মুসলমানের মেয়ে রোশনারা। পুতুল-পূজায় তার বিশ্বাস নেই।

ইচ্ছে করলে ঐ নারায়ণের সামনে বসে দুটো ফুল ছুঁড়ে দিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারে।

কিন্তু তাতে যদি অভিজিতের কোন অনিষ্ট হয়!

আমি তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারি, মা?

পূজোর যে আমি কিছুই জানি না, মা?

ধোয়া কাপড় পড়ে শুদ্ধ চিত্তে দুটো ফুল, কিছু ফল দেবে ঠাকুরের সামনে। এইটুকু পারবে না, বৌমা?

শরীর নিশ্চয় খুবই খারাপ হয়েছে ভবতারিণীর।

মুখের কথা জড়িয়ে আসছে তাঁর।

রোশনারা কি করবে ভেবে পায় না।

আত্মরক্ষার জন্যে একটা নিষ্ঠাবান পরিবারের ধর্ম-বিশ্বাসে আঘাত করতে বাধে। অভিজিতের ক্ষতির আশংকাও মন থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে না।

তার চেয়ে এক কাজ করবে রোশনারা। সব কথা খুলে বলবে অভিজিতের মায়ের কাছে। তারপরেও যদি তিনি আশ্রয় দেন, রোশনারা থাকবে। আর যদি বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে বলেন, এখান থেকে সোজা ঢাকায় চলে যাবে। তারপর আত্ম-সমর্পণ করবে পুলিশের হাতে।

আপনি একবার ঘরের ভেতর আসবেন, মা?

নিজের কর্তব্য স্থির করে নিয়েছে রোশনারা।

ভবতারিণী জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তুলে পুত্র-বধূর মুখের দিকে তাকালেন।

শরীরটা কাল রাত থেকেই খারাপ করেছে, মা। পাঁচজনের সংসার—না কাজ করেও পারি না। চারিদিকে গোলমালের মধ্যে ছেলেটাও আবার ঢাকায় গেল!

ভবতারিণী ঘরের মধ্যে গেলেন।

একটা কথা আপনাকে বলা খুবই প্রয়োজন মনে করছি, মা। মস্ত বড় একটা অপরাধ আমি করেছি আপনার কাছে।

শংকিত হয়ে উঠলেন ভবতারিণী।

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, বৌমা, কি অপরাধ তুমি করেছো?

সব শোনার পরেও যদি ক্ষমা করতে পারেন, আমি নিজেকে ধন্য মনে করব। যদি ক্ষমা করতে না পারেন, যেখানে যাবার আমি চলে যাবো। তবু জেনে-শুনে আপনার মনের ওপর আঘাত দিতে পারবো না।

আমি কিন্তু খুবই অস্থিরবোধ করছি, বৌমা। যা বলবে তাড়াতাড়ি বলে ফেলো।

আপনি রোশনারা চৌধুরীর নাম শুনেছেন?

ঢাকার রোশনারা চৌধুরী? যে নতুন বিপ্লবের মন্ত্র দিয়ে বেড়াচ্ছে মানুষের মনে?

হ্যাঁ মা, সেই রোশনারা চৌধুরী। সামরিক সরকার তাকে ধরবার জন্যে হন্যে হয়ে খুঁজছে।

আহারে! অমন মেয়ে দেশের রত্ন, মা। অভিজিতের মুখে অনেক শুনেছি তার কথা।

আমিই সেই রোশনারা চৌধুরী, মা।

বৌমা!

আপনার নারায়ণের গায়ে দুটো ফুল ছুঁড়ে দিলে আপনি কিছুতেই বুঝতে পারতেন না। কিন্তু মন আমার তাতে সায় দিল না।

তুমি, তুমিই রোশনারা চৌধুরী?

হ্যাঁ, মা।

অভিজিৎ জানে?

জানে। তবে আমি যে আপনার কাছেই আশ্রয় চাইবো, এ কথা অভিজিৎ ঘাটে এসেই প্রথম শুনেছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রোশনারা আবার বলল, আপনি সব শুনলেন, মা। এবার যদি চান, আমি এখান থেকে এই মুহূর্তে চলে যাবো। তারপর আত্ম-সমর্পণ করবো সামরিক সরকারের কাছে।

অবিশ্বাসের কিছু নেই, ভবতারিণী রোশনারা চৌধুরীর দিকে চাইলেন।

এই সেই রোশনারা চৌধুরী! সমস্ত দেশ আজ এই মেয়েটির প্রশংসায় সোচ্চার।

মাথা নীচু করে বসে রইল রোশনারা।

সব কিছু নির্ভর করছে অভিজিতের মায়ের একটা কথার ওপর।

ভবতারিণী সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলতে পারলেন না।

মানুষ আর ধর্ম দুয়ের দ্বন্দ্ব বেধেছে তার মনের মধ্যে।

মা?

রোশনারা মৃদু কণ্ঠে ডাকলেন ভবতারিণীকে।

হঠাৎ ভবতারিণী উঠে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন রোশনারাকে।

রোশনারাও নিজেকে ছেড়ে দিল একটি মাতৃ-হৃদয়ের কাছে।

তুমি কোথাও যাবে না। যতদিন ইচ্ছে এইখানে থাকবে। তোমার পরিচয়ও কেউ জানবে না, মা।

কেন জানি না রোশনারার দু'চোখে জল এলো।

উঠে ভবতারিণীর দু'পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল রোশনারা।

জল এলো ভবতারিণীর চোখেও।

আচ্ছা মা, অভিজিতের ওপরে তোমার অগাধ বিশ্বাস, তাই না?

রোশনারার বুঝতে অসুবিধা হয় না কোন্ ইঙ্গিত রয়েছে ভবতারিণীর কথায়।

সঙ্গে সঙ্গে রোশনারা উত্তর দিল, আপনার ছেলের মত ছেলে হয় না, মা।

ভবতারিণী উঠে দাঁড়ালেন।

যাই মা, নারায়ণ আবার ক্ষিধেয় অস্থির হবে।

দরজা পর্যন্ত গিয়েও আবার ঘুরে দাঁড়ালেন ভবতারিণী।

বলে তুমি ভালই করলে, বৌমা। তোমার কোন ভয় নেই এখানে। প্রয়োজন হলে সারাজীবন তুমি এখানে থাকবে। কেউ কিছু বলবে না, জানতে পারবে না কেউ।

ভবতারিণী তাঁর নারায়ণ পূজার উদ্দেশ্যে কাঁপতে কাঁপতে চলে গেলেন।

কোল-বালিশটা টেনে নিয়ে আবার শুয়ে পড়ল রোশনারা।

বাড়ীর এখনো অনেকেই ওঠেনি।

আরো আধ-ঘণ্টার মত কাটানো যেতে পারে।

অনেকখানি নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

অভিজিৎ এসে সব শুনে নিশ্চয়ই আনন্দিত হবে।

অভিজিতের বালিশ দুটো নিজের কাছে টেনে নিতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় দরজার বাইরে শীলার গলা শোনা গেল: অভিদার বদলে বালিশ দিয়ে বুঝি সখ মেটাচ্ছো?

এই মুখপুড়ী!

ধমকে ওঠে রোশনারা।

খিলখিল করে হাসতে থাকে শীলা।

দাঁড়াও, অভিদা এলে বলতে হবে যে, বৌদি অভিদার চেয়ে তার বালিশ দুটোকেই বেশী ভালবাসে।

এই শোনো।

শীলাকে ভেতরে ডাকলো রোশনারা।

স্বল্প পরিসর একটি কক্ষ।

খুব বেশী হলে লম্বায় দশ হাত আর চওড়ায় আট হাত।

ঘরের আসবাব বলতে একটিমাত্র চেয়ার। চেয়ারখানা ঘরের মাঝখানে রাখা। সামনের দেওয়ালে অনেকগুলো বাল্ব।

একটা বাল্ব থেকে উজ্জ্বল লাল আলো ছড়িয়ে পড়েছে ঘরময়।

তিনজন লোক কক্ষে প্রবেশ করল।

তিনজনের মধ্যে একজনের চোখ কালো কাপড় দিয়ে শক্ত করে বাঁধা।

অপর দু'জনের একজন চোখ-বাঁধা লোকটাকে চেয়ারের ওপর বসিয়ে দিল। তৃতীয় ব্যক্তি চেয়ারের পেছনে সরে গিয়ে বলল, ইউসুফ, এবার চোখ খুলে দাও। চোখ খুলে দিতেই লাল আলোর দিকে তাকিয়ে দু'হাত দিয়ে চোখ চেপে ধরল লোকটা।

আমাকে ছেড়ে দিন। যা জানি, তার একবর্ণও গোপন রাখিনি। ছেড়ে দিন আমাকে।

কান্নায় ভেঙে-পড়া কণ্ঠস্বর লোকটার।

ইউসুফ!

হুজুর?

চেয়ারের পেছনের লোকটি আবার বলে উঠলো, রহমান সাহেবকে গিয়ে খবর দাও।

ইউসুফ চলে গেল।

দু'হাতে চোখ চেপে ধরেই বসে রইল লোকটা।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই আতাউর রহমান কক্ষে প্রবেশ করলেন।

চেয়ারে উপবিষ্ট লোকটার মুখের কস বেয়ে একটা মোটা রক্তের ধারা নেমে সার্টের অনেকখানি ভিজিয়ে দিয়েছে।

আতাউর রহমানের সাথে ইউসুফও ফিরে এসেছিল।

আতাউর রহমান ইউসুফকে বললেন, একি! এঁর এই অবস্থা কে করেছে?

আস্তে আস্তে চোখের পাতার ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিল লোকটা।

কান্না ধরা গলায় বলল, আমাকে ছেড়ে দিন, রহমান সাহেব। আমি আবার বলছি রোশনারা কোথায় আছে আমি জানি না।

হঠাৎ বাল্বটা নিভে গেল। একটা সবুজ বাল্ব জ্বলে উঠলো বোর্ডের ওপর।

আপনি উতলা হবেন না, সুলতান চৌধুরী।

আতাউর রহমান বললেন, আপনার ওপরে অন্যায় ভাবে যারা হাত তুলেছে, তাদের একজনকেও আমি ছাড়বো না।

ইউসুফের দিকে ফিরে আতাউর রহমান সাহেব বললেন, আমার টেবিলের ডান দিকের ড্রয়ারে ডেটল আর তূলো আছে নিয়ে এসো।

কণ্ঠস্বর খুব নীচু করে ঠিক যেন ফিসফিসিয়ে আতাউর রহমান বলে চললেন, অপদার্থগুলোর একটাকেও আমি ছেড়ে কথা কইবো না। আপনি দেখবেন মিঃ চৌধুরী, কি রকম সাজা ওরা পায়।

ইউসুফ ডেটল আর তূলো নিয়ে এলো।

নিজের হাতে তূলোয় ডেটল ঢেলে সুলতান চৌধুরীর কসে লাগিয়ে দিলেন আতাউর রহমান।

করুণ দৃষ্টিতে সুলতান চৌধুরী আতাউর রহমানের মুখের দিকে চাইলো।

কোন চিন্তা করবেন না, মিঃ চৌধুরী। আপনি একটু সুস্থ হোন, আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আপনার বাসায় পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করব।

হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আতাউর রহমান বললেন, তাছাড়া রাতও প্রায় শেষ হতে চলল।

ওসমান আর ইউসুফ, তোমরা এখন এখান থেকে চলে যেতে পারো।

আতাউর রহমানের কথায় ওরা বেরিয়ে যাচ্ছিল।

একটা চেয়ার দিয়ে যেও, ইউসুফ। আমরা বাকী রাতটুকু এখানে কথা-বার্তা বলে কাটিয়ে দিই। রাত তিনটে বেজে গেছে, মিঃ চৌধুরী। একেবারে সকাল হলেই যাবেন।

ইউসুফ একটা চেয়ার দিয়ে যেতে আতাউর রহমান চেয়ারখানা

সুলতান চৌধুরীর চেয়ারের খুব কাছে টেনে নিয়ে বসে পড়লেন।

এক জ্বালার চাকরী হয়েছে আমাদের। বিয়ে করেছি, কোথায় বৌয়ের পাশে শুয়ে রাত কাটাবো, তা না, এই রাতেও অফিসের কাজ!

সুলতান চৌধুরীর সোজা হয়ে বসার ক্ষমতা ছিল না।

আতাউর রহমানের কথার সমর্থনের জন্যে সামান্য নড়ে বসল।

আচ্ছা মিঃ চৌধুরী, শুনেছি রোশনারা চৌধুরীর সঙ্গে আপনার বিয়ে হবে?

ক্ষীণকণ্ঠে সুলতান চৌধুরী উত্তর দিল: আপনি ঠিকই শুনেছেন, মিঃ রহমান। আমরা যখন খুব ছোট, তখনই আমাদের বিয়ের কথা পাকা হয়। আমার বাবা আর রোশনারার বাবা দু'জনে দু'জনকে কথা দেন।

এ বিয়েতে আপনার মত আছে?

আপত্তি করার মত কোন কারণ দেখিনি, মিঃ রহমান।

মিস চৌধুরী সুন্দরী, সুশিক্ষিতা। তদুপরি তিনি ছাত্র-সমাজের নেতৃস্থানীয়া। আপনার কি এখনো ধারণা যে, মিস চৌধুরীর মত আধুনিক সভ্যতার আলোক-প্রাপ্তা মেয়ে ছোটবেলার সেই বাক্যদান এখনো মেনে চলবেন?

রোশনারার কাছে আপত্তির কথা কোন দিনই আমি শুনিনি, মিঃ রহমান।

ধরুন মিঃ চৌধুরী, মিস রোশনারা চৌধুরীর বর্তমানের যত কাজ সব ছাত্রদের নিয়ে, ছাত্র-সমাজে আপনার অপেক্ষা সুপুরুষ ছাত্রের অভাব নেই, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছাত্রও অনেকেই আছে। (তাদের মধ্যে কারো প্রেমেও তো পড়তে পারেন?)

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আতাউর রহমান আবার বললেন, আমার কথার অন্য কোন অর্থ করবেন না। আমি শুধু বলতে চাইছি, এমনটা ঘটা অসম্ভব নয়। স্ত্রীলোকের চরিত্র নাকি, হিন্দুরা বলে, তাদের

দেবতাদেরও অজ্ঞাত। আমার এ আলোচনাও বাকী রাতটুকু কাটাবার জন্যে, মিঃ চৌধুরী। অন্য কোন রকম উদ্দেশ্য নেই।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুলতান চৌধুরী আতাউর রহমানের কথার উত্তর দিতে পারলো না। সবুজ বাল্বটার দিকে একবার তাকালো।

এমন সম্ভাবনার কথা তারো মনে মাঝে মাঝে এসেছে। কিন্তু রোশনারার সহজ ও সরল ব্যবহারে কোনদিন গুরুত্ব দিতে পারেনি এই সম্ভাবনাকে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে মিঃ রহমান, রোশনারা আর যাই করুক, তার পিতার দেওয়া প্রতিশ্রুতি অমান্য করবে না।

তা হয়ত হবে, মিঃ চৌধুরী। কারণ মিস চৌধুরীর কথা আপনার যত বেশী জানবার কথা, আর কারো পক্ষে ততটা নয়।

সুলতান চৌধুরী আর কিছু বলল না।

আমি এই ভেবে বিস্মিত হচ্ছি, মিঃ সুলতান চৌধুরী, যে মেয়ের সাথে আজ বাদে কাল আপনার বিয়ে হবে, চিরদিনের মত যে আপনার জীবন-সঙ্গিনী হয়ে আসবে, সে কোথায় চলে গেল—আপনাকেও একবার জানাবার প্রয়োজন বোধ করল না!

এবারো সুলতান চৌধুরী কোন উত্তর দিতে পারলো না।

আপনারও কি উচিৎ ছিল না একবার খোঁজ করা? আপনি বলছেন, আপনি কিছুই জানেন না। আপনার কথা ডিপার্টমেণ্ট মেনে নিয়েছে। কিন্তু আপনি কি বলে আপনার মনকে সান্ত্বনা দিলেন?

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা তুলে নিয়ে এগিয়ে দিলেন সুলতান চৌধুরীর দিকে। তারপর নিজে একটা ধরালেন।

ধরুন সামরিক কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার জন্যে মিস চৌধুরী এমন একজনের কাছে আশ্রয় নিয়েছেন, যার পক্ষে নিঃসঙ্গ মিস চৌধুরীর রূপে আকর্ষিত হয়ে উত্তেজনা অনুভব করা স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে মিস চৌধুরীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে বাধ্য। যতই তিনি

ক্ষমতাশালী হোন, একা একটা মেয়ের পক্ষে কোন পুরুষের লোভাতুর দৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করতে পারা খুবই কঠিন। অপনি কি একবারো এদিকটা ভেবে দেখেননি ?

ঝুঁকে-পড়া দেহটা হঠাৎ সোজা হয়ে গেল সুলতান চৌধুরীর। নিভন্ত দুটো চোখও যেন জ্বলে উঠলো।

জ্বলন্ত সিগারেটসহ ডান হাতখানা মাথার ওপরে তুলে ধরলেন আতাউর রহমান।

সঙ্গে সঙ্গে কক্ষের সবুজ আলো নিভে গিয়ে আবার পূর্বের লাল আলো জ্বলে উঠলো।

আপনি মস্ত বড় ভুল করেছেন, মিঃ চৌধুরী।

ভুল !

হ্যাঁ, ভুল।

সিগারেটে একটা দীর্ঘস্থায়ী টান দিলেন আতাউর রহমান।

আমি বলব, ভুলই আপনি করেছেন। দু'দিন পরে যিনি আপনার স্ত্রী হয়ে আসবেন, তাঁকে অন্তত অরক্ষিত অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া উচিত হয়নি।

আমি আমাকে সঙ্গে নিতে বলেছিলাম, মিঃ রহমান। কিন্তু আমাকে নিতে চায়নি রোশনারা।

কেন ?

আমি ঠিক জানি না।

মিথ্যে কথা। আপনি জানবার চেষ্টা করেননি।

তা হবে।

তাহলে কে গেল তার সঙ্গে ?

আতাউর রহমান নিজের চেয়ারটা আরো সরিয়ে নিয়ে গেলেন চৌধুরীর চেয়ারের কাছে।

সুলতান চৌধুরী লাল বাল্বটার দিকে চাইলো।

আমি জানি না, মিঃ রহমান।

সুলতান চৌধুরী আবার ভেঙে পড়ল।

আপনি অত্যন্ত নির্বোধ, মিঃ চৌধুরী!

উত্তেজিত ভাবে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন আতাউর রহমান।

ঘন ঘন টান দিয়ে হাতের সিগারেটটা ফেলে দিয়ে আর একটা ধরালেন।

সুলতান চৌধুরীর হাতের সিগারেট একটু একটু করে পুড়ে চলেছে।

সামরিক সরকার খুব বেশী দিন শাসন-ভার নিজের হাতে রাখবে না, মিঃ চৌধুরী। রোশনারা চৌধুরী যখন ফিরে আসবেন, সেদিন আপনি কাছে গেলেই বুঝতে পারবেন, আপনার রোশনারা তাঁর হৃদয় থেকে ডিসেন্ট করে আপনাকে বাদ দিয়ে অপর একজনকে স্থান দিয়েছেন। আপনার অধিকার আপনি হারিয়েছেন মিস রোশনারা চৌধুরীর দেহের ওপর। সেই দেহ অধিকার করেছে অপর একজন।

মিঃ আতাউর রহমান!

আমি কোন আক্রোশের বশে বলছি না, সুলতান চৌধুরী। আপনার ভুল আমাকে উত্তেজিত করে তুলেছে মাত্র। কিন্তু এটুকু জেনে রাখুন, মেয়েদের পক্ষে নিরাপদ স্থান মাত্র একটাই আছে আর তা হল স্বামী। আপনি আজ সকালেই বাড়ী চলে যান। খুঁজে বের করুন রোশনারা চৌধুরীকে। দেখবেন আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হয় কিনা।

অসম্ভব। রোশনারা আমাকে কিছুতেই ঠকাবে না।

উত্তেজিত হয়ে ওঠে সুলতান চৌধুরী।

আর একটা লাল বাল্ব জ্বলে ওঠে বোর্ডে।

আমি সে-কথা বলছি না, মিঃ চৌধুরী। আমার বক্তব্য হচ্ছে, অপর কেউ মিস চৌধুরীকে ঠকাতে পারে। তার সর্বস্ব লুঠ করতে পারে। দেশের মানুষের স্বভাব আপনার অজানা নেই।

সুলতান চৌধুরী আতাউর রহমানের মুখের দিকে তাকালো।

আপনি চিন্তা করে দেখুন, মিঃ চৌধুরী, রোশনারা চৌধুরীর আশেপাশে তেমন কেউ ছিল কিনা। নিজের হক কেউ ছাড়ে না। আপনিই বা কেন ছাড়বেন ?

আরো একটা আলো জ্বলে ওঠে ঘরের মধ্যে।

লাল রক্তের মত আলো।

এও কি কখনো হয় ?

হয়, বলছেন কি ? হাজার লক্ষ উদাহরণ আমি আপনাকে দেখাতে পারি।

একটু থেমে আতাউর রহমান বললেন, আমি মিনিট কয়েকের জন্যে বাইরে যাচ্ছি, মিঃ চৌধুরী। আপনি ততক্ষণ আমার কথা-গুলো চিন্তা করে দেখুন, কোন অন্যায় আমি বলেছি কি না।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন আতাউর রহমান।

ঘরের মধ্যে যেন লাল আলোর বন্যা বইছে।

চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে বসে আছে সুলতান চৌধুরী।

কপালের রেখাগুলো কুঁচকে গেছে।

চোখ দুটো বন্ধ করেছে সুলতান চৌধুরী।

মিনিট দশেক পরেই আতাউর রহমান ফিরে এলেন।

এখান থেকে গিয়ে কি করবেন ঠিক করলেন ?

আমি কিছু বুঝতে পারছি না, মিঃ রহমান।

আপনি কিছু বুঝতে পারছেন না, তা ঠিক নয়, মিঃ চৌধুরী। আপনি কিছু করতে পারছেন না।

তার মানে ?

সুলতান চৌধুরী আতাউর রহমানের মুখের দিকে চাইলো।

আপনি সব জানেন কিন্তু কিছু করতে পারছেন না। কারণ আপনি অত্যন্ত দুর্বল, আপনি ক্লিব।

মিঃ আতাউর রহমান !

আমি বলছি আপনি সব জানেন। আপনি জানেন মিস চৌধুরী কোথায় আছেন।

সুলতান চৌধুরী নির্বাক।

ইউসুফ।

হুজুর ?

বাইরে থেকে ইউসুফের সাড়া পাওয়া গেল।

লোকটাকে নিয়ে এসো ইউসুফ।

ইউসুফ প্রস্তুত হয়েই ছিল। রহমান সাহেবের কথা শেষ হবার আগেই একটা লোককে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলো।

দেখুন তো মিঃ চৌধুরী, একে চিনতে পারেন কিনা।

সুলতান চৌধুরী লোকটার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো।

আতাউর রহমানের দিকে তাকিয়ে বললো, এদের অসাধ্য বুঝি দুনিয়াতে কিছুই নেই।

খুব বেশী অসুবিধা হবার কথা তো নয়, মিঃ চৌধুরী !

অস্বীকার করে লাভ নেই।

সম্মতিসূচক মাথা ঝাঁকালো সুলতান চৌধুরী।

পরের দিন যথা সময়ে ব্রিগেডিয়ার ওসমানের কাছে উপস্থিত হলেন আতাউর রহমান।

বসতে বলে ব্রিগেডিয়ার ওসমান প্রশ্ন করলেন ঃ বলুন মিঃ রহমান, আপনার অগ্রগতি কতদূর।

আজ সন্ধ্যে বেলায় আমার দু'খানা গাড়ী আর কিছু লোক চাই।

কোথায় যেতে হবে ?

ঢাকার বাইরে।

ব্রিগেডিয়ার ওসমান সরাসরি আতাউর রহমানের মুখের দিকে তাকালেন।

মনে হচ্ছে আপনি কিছুদূর অগ্রসর হয়েছেন, মিঃ আতাউর

রহমান। রোশনারা চৌধুরীকে যেখান থেকে হোক ধরে আনুন। সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তানে আজ ছাত্ররাই একমাত্র সমস্যা। পুরোনো নেতাদের প্রভাব কমে আসছে। জনসাধারণও রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে পেছিয়ে পড়েছে। শূণ্যস্থান পূরণ করার জন্যে এগিয়ে এসেছে ছাত্র-সমাজ। আর পূর্ব-বাংলার ছাত্র-সমাজের একটি প্রভাবশালী অংশের নেতৃত্ব করছে ঐ রোশনারা চৌধুরী। সুতরাং বুঝতেই পারছেন যে, ঐ রোশনারা চৌধুরীকে আটক করতে পারলে ছাত্রদের মনোবল ভেঙে দেওয়া কতখানি সহজ হবে।

কতখানি সফল হতে পারবো জানি না, স্যার। তবে রোশনারা চৌধুরীকে খুঁজে বের করার একটা পথ আজ বের করবই।

আপনার সাফল্য কামনা করি, মিঃ আতাউর রহমান।

আমি তাহলে চলি, স্যার। ঠিক সাতটায় আমি উপস্থিত হবো।

গাড়ী আর লোক আপনার অপেক্ষায় প্রস্তুত হয়ে থাকবে।

আফিস থেকে বেরিয়ে সোজা বড় রাস্তা ধরে হাঁটতে সুরু করলেন আতাউর রহমান। একবার পকেটে হাত দিয়ে রিভলভারের অস্তিত্ব জেনে নিলেন।

ঢাকা সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

রাজধানীর বাইরে যে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল মফঃস্বল শহরে, তাও আজ বন্ধের পথে।

রোশনারা চৌধুরীকে ধরে দিতে পারলে পূর্ব-পাকিস্তান বোবা হয়ে যাবে।

উন্নতির সোপান বেয়ে ওপরের দিকে আরো এক ধাপ উঠবেন তিনি।

ঘর অন্ধকার।

ঘরে ঢুকে হ্যারিকেনটা নিজের হাতে নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় গিয়ে উঠেছে রোশনারা।

ঘরে আলো জ্বললে ওর ঘুম আসে না।

আগের মতই বালিশ নিয়ে মেঝেয় শুয়ে পড়েছে অভিজিৎ।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজলো।

ঢাকা থেকে অভিজিৎ ফিরেছে সাড়ে এগারোটায়।

প্রতিদিনের মতো আজো রাত এগারোটা পর্যন্ত অভিজিতের জন্য অপেক্ষা করে রোশনারাকে নিয়ে ভবতারিণী যখন খেতে বসেছিলেন, তখনই দরজার কড়া নেড়েছিল অভিজিৎ।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ভবতারিণী কোন বাক্যালাপ না করে অভিজিতের জন্যে ভাত বেড়ে দিয়েছিলেন।

রোশনারা বা অভিজিৎ কারো চোখে ঘুম নেই।

টিক্-টিক্-টিক্-টিক্।

দেওয়াল-ঘড়ির শব্দ হচ্ছে।

ঘুমিয়ে পড়েছো ?

রোশনারা শুয়ে শুয়েই মৃদুকণ্ঠে অভিজিতের উদ্দেশ্যে বলল।

না।

ঘুম আমারও আসছে না। অবশ্য এই কয় রাত্রিই আমার ঘুম আসেনি।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লো রোশনারা।

মাকে আমি সব কথা খুলে বলেছি।

কি বলেছো ?

রোশনারার কথা।

মা কি বললেন ?

উত্তেজনায় উঠে বসল অভিজিৎ।

আমি আজো এখানে বহাল আছি দেখেই তোমার অনুমান করা উচিৎ, মা কি বলেছেন।

তোমার বলতে যাওয়া উচিৎ হয়নি রোশনারা। বিশেষ করে আমার অবর্তমানে। যদি কোন অঘটন ঘটতো ?

পরিস্থিতি এমনই এক পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল অভিজিৎ, আমার না বলে উপায় ছিল না। নিজের সামান্য স্বার্থের জন্য মায়ের ধর্ম-বিশ্বাসে আমি আঘাত করতে পারিনি।

মা কি বললেন ?

সব কথা শুনে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। অভয় দিয়ে বললেন, যেমন আছো তেমনি থাকবে এখানে। তৃতীয় কানে যাবে না তোমার কথা।

যাক্।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো অভিজিৎ।

তুমি অন্তত মায়ের ভাগ্যে ভাগ্যবান, অভিজিৎ।

বাড়ীর অপর কেউ তাহলে তোমার আসল পরিচয় জানে না ?

না, অভিজিৎ।

একটা মস্ত দুশ্চিন্তা থেকে বাঁচলাম।

ঢাকার খবর তো কিছুই বললে না !

মিলিটারীর ভয়ে সব স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

ইউনিভারসিটি ?

এখনো খোলেনি। তবে যথারীতি ভীড় জমছে জিন্নৎ মহলে।

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ?

আজ পর্যন্ত কেউ ধরা পড়েননি।

কিছুক্ষণের জন্যে নিস্তব্ধতা নেমে এলো অন্ধকার ঘরের মধ্যে।

সুলতান চৌধুরীকে য়্যারেস্ট করেছে।

অনেকক্ষণ ইতঃস্তত করার পর অভিজিৎ বলে ফেললো।

সুলতান চৌধুরী ধরা পড়েছে ?

কাল সকালে ঘুম থেকে তুলে নিয়ে গেছে।

সুলতান চৌধুরী ধরা পড়ায় তুমি খুব চিন্তিত হলে মনে হচ্ছে ?

চিন্তিত হবার কথা, অভিজিৎ।

তা বটে ! আমি আবার মাঝে মাঝে ভুলে যাই সুলতান চৌধুরীর

সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে।

রোশনারা কোন উত্তর দিল না।

আরো একটা খবর আছে।

কি ?

প্রফেসার জয়ন্ত বোস আত্মহত্যা করেছে।

প্রফেসার জে. বি. ?

কোন কারণ জানো ?

একটু থেমেই আবার জিজ্ঞাসা করল রোশনারা।

ভদ্রলোকের জন্যে দুঃখ হয়। অত বড় একটা বৈজ্ঞানিকের জীবন ঐ অন্ধকার ঘরের মধ্যে গলায় দড়ি দিয়ে শেষ হবে, ভাবতেও আশ্চর্য লাগে।

পুলিশ অনুসন্ধান করছে।

আর শ্রীলা ?

তাকে বিছানায় মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।

সব শেষ হয়ে গেল।

আর একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো রোশনারা।

ওদের জীবনের এমনি একটা পরিণতি হবে, আমি জানতাম অভিজিৎ। প্রফেসার জে. বি-র কথা অবসর মুহূর্তে যখনই বসে ভেবেছি, কেন জানি না মন বলেছে, এমনি একটা পরিণতিই দেখা দেবে ওদের জীবনে। ভালই হল। দুর্ঘটনার মধ্যে ওরা এক হয়েছিল। দুর্ঘটনার মধ্যেই একসঙ্গে শেষ হয়ে গেল।

দু'জনে আবার চুপচাপ।

দেহের মধ্যে একটা অস্বস্তি অনুভব করছে অভিজিৎ।

রোশনারার কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

রোশনারার গায়ের অথবা পোষাকের একটা মিষ্টি গন্ধ আসছে নাকে।

গোলমাল, অশান্তি, ধর-পাকড়—একদিন সব থেমে যাবে। রোশনারা ফিরে যাবে তার সংসারে।

অভিজিতের কতো রাত কাটবে এই ঘরে ঐ রোশনারার কথা ভেবে ভেবে।

রোশনারার সাথে পরিচয় না হওয়াই হয়তো ভাল ছিল।

কখন যেন একটু তন্দ্রা এসেছিল মায়ের ডাকে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল অভিজিৎ।

অভি, তাড়াতাড়ি দরজা খোল।

মা ?

হ্যাঁ রে। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দে, বাবা।

অভিজিৎ তাকিয়ে দেখলো ঘরের মধ্যে ঘন অন্ধকার।

অভিজিৎ উঠে আলো জ্বালবার জন্যে এগিয়ে যেতেই রোশনারার সঙ্গে মৃদু ধাক্কা লাগলো।

তুমি দরজা খুলে দাও, আমি আলো জ্বেলে দিচ্ছি।

নিজেকে সামলে নিয়ে আলো জ্বালবার জন্যে এগিয়ে গেল রোশনারা।

অভিজিৎ দরজা খুলে দিতেই ভবতারিণী হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

ততক্ষণে আলো জ্বেলে দিয়েছে রোশনারা।

বিস্মিত অভিজিৎ লক্ষ্য করল, মা যেন থরথর করে কাঁপছেন।

কি হয়েছে, মা ?

বাড়ীর সামনে খান তিনেক মিলিটারী গাড়ী এসে থেমেছে, শব্দ শুনে জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকাতে দেখি, এক এক করে গাড়ী ঢুকছে সামনের লনে।

ওরা হয়ত এখুনি এসে দরজায় ধাক্কা দেবে।

অভিজিৎ রোশনারার মুখের দিকে তাকালো।

রোশনারার মুখের ওপর একটা কঠিন আবরণ দেখতে পেল অভিজিৎ।

খট্‌-খট্‌-খট্‌-খট্‌-খট্‌।

কড়া নড়ে উঠলো নীচের তলায়।

ওরা এসে পড়েছে, অভিজিৎ।

ভবতারিণী একবার অভিজিৎ আর একবার রোশনারার মুখের দিকে তাকালেন।

(কোন ভয় নেই, রোশনারা। আমি যতক্ষণ বেঁচে থাকবো, কারো সাধ্য হবে না তোমার গায়ে কেউ হাত দেয়।)

অভিজিৎ জামা গায়ে দিয়ে রোশনারার ক্ষুদ্র মৃত্যু দূতটাকে জামার তলায় কোমড়ে গুঁজে নিল।

ওকে একটু দেখো, মা। আমি নীচে গিয়ে দেখিগে কি ব্যাপার!

রোশনারা এতক্ষণ পাথরের মত দাঁড়িয়েছিল।

অভিজিৎকে অগ্রসর হতে দেখে বিদ্যুৎ বেগে দরজার সামনে গিয়ে অভিজিতের পথ রোধ করে দাঁড়ালো।

আপনি আলো নিয়ে দেখে আসুন, মা। আগে দরজা খুলবেন না। আমি জানি ওরা কি জন্যে এসেছে। আমি ওকে যেতে দেবো না, মা।

তোমাদের কাউকে যেতে হবে না। আমি গিয়ে দেখে আসি।

ভবতারিণী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রোশনারা!

আমি তোমাকে কিছুতেই যেতে দেবো না, অভিজিৎ।

তা হয় না রোশনারা, আমাকে যেতে দাও। মা কি বলতে কি বলবেন!

মা ঠিকই বলবেন। তুমি চুপচাপ খাটের ওপরে গিয়ে বসো।

অভিজিৎ বিস্মিত হল রোশনারার ব্যস্ততা দেখে।

উত্তেজনায় রোশনারার সর্বশরীর যেন কাঁপছে।

পথ ছেড়ে দাও, রোশনারা।

না।

রোশনারা !

না-না অভিজিৎ, এমন করে নিজেকে আমি রিক্ত হতে দেবো না।

অভিজিতের সামনে বিস্ময়ের পর বিস্ময়।

কি বলতে চাইছে ও ?

তোমার খোঁজে মিলিটারী এসেছে, আমি এ সময়ে ঘরে বসে থাকবো ?

আমি শপথ করে বলতে পারি, অভিজিৎ, ওরা আমার খোঁজে আসেনি।

তবে ?

ওরা এসেছে তোমাকে ধরে নিয়ে যেতে।

আমাকে ?

সুলতানের খবর যখনই দিয়েছো, আমি বুঝতে পেরেছি এমন একটা ঘটবেই। কিন্তু আমি হতে দেবো না।

আমাকে যেতে দাও, রোশনারা। আমি ধরা পড়লে তুমি আরো বেশী নিরাপদ হবে।

অমন নিরাপত্তা আমি চাই না, অভিজিৎ।

হঠাৎ দরজা ছেড়ে রোশনারা অভিজিতের সামনে এসে দাঁড়ালো। দু'হাতে অভিজিতের দুটো হাত তুলে নিয়ে রোশনারা বলল, আমার একটা কথা রাখো অভিজিৎ, তুমি ওদের কাছে যেও না।

অভিজিৎ নিরুত্তর।

কথা দাও তুমি যাবে না ?

রোশনারার কণ্ঠে অনুরোধ ঝরে পড়তে লাগলো।

ভবতারিণী ফিরে এলেন।

ওরা অভির সন্ধানে এসেছে।

ভবতারিণীর কণ্ঠ কোন্ গভীর খাদে নেমে গেছে।

আমি জানতাম, ওরা আপনার ছেলেকেই ধরতে আসবে।

রোশনারার কথা না শুনেই অভিজিৎ নীচে নেমে গেল।

নীচের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আতাউর রহমান বললেন, ইউ আর আণ্ডার য়্যারেস্ট, মিঃ অভিজিৎ রায়।

আমার অপরাধ ?

আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ অনেক। প্রধান অপরাধ আপনি ইষ্ট এণ্ড মেডিক্যাল স্টোর্স লুঠ করেছেন। হত্যা করেছেন তার মালিককে।

এখনিই যেতে হবে ?

এক মুহূর্ত বিলম্ব নয়, মিঃ রায়।

একবার মায়ের সাথে দেখা করে আসবার সুযোগ পেতে পারি ?

কি ভেবে আতাউর রহমান বললেন, বেশী দেরী যেন না হয়, মিঃ রায়।

আমি যাবো আর আসবো।

দোতলায় উঠে গেল অভিজিৎ।

ঘরের মধ্যে রোশনারা দাঁড়িয়ে আছে।

মা ?

পাশের ঘরে।

তোমার অনুমানই ঠিক, রোশনারা। ইষ্ট এণ্ড লুঠের ও মালিক হত্যার অপরাধে ওরা আমাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছে। এ অন্য কারো কাজ নয়, সুলতান চৌধুরীর।

দাঁতে দাঁত ঘসলো অভিজিৎ।

রোশনারা নিরুত্তর।

(আমি আসি, রোশনারা। তুমি যতদিন ইচ্ছে এখানে থেকো। মা দেখবেন।

আমি যে চিরদিন এখানে থাকতে চাই, অভিজিৎ।

রোশনারা !

অভিজিৎ অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, রোশনারার দু'চোখে জল।)

(এগিয়ে গিয়ে রোশনারার দু' কাঁধে হাত রাখলো অভিজিৎ।)

মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে রোশনারা বলল, আমি তোমাকেই একমাত্র ভালবাসি, অভিজিৎ।

কি যেন হল অভিজিতের।

বুকের হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠছে। ঘরখানা হাজার গুণ আলোয় ভরে গেছে।

অনেক দূর থেকে খুশীর বন্যা এগিয়ে আসছে।

(সজোরে রোশনারাকে টেনে নিয়ে নিজের বুকের ওপর চেপে ধরল অভিজিৎ।)

জলভরা চোখে রোশনারা মুখ তুলে তাকালো অভিজিতের দিকে।

আর আমার কোন ভয়, কোন সংশয় নেই, রোশন।

(যদি সারা জীবন ধরেও অপেক্ষা করতে হয়, আমি তোমার পথ চেয়ে থাকবো, অভিজিৎ। আমি যেখানেই থাকি কথা দিলাম, যেদিন তুমি মুক্ত হবে সেদিনই আমাকে কাছে পাবে)

নীচে থেকে আতাউর রহমানের কণ্ঠ শোনা গেল ঃ দেরী করবেন না, মিঃ রায়।

(আমি আসি, রোশনারা ?

তোমার অবর্তমানে আমি কি নিয়ে কাটাবো, তাতো বলে গেলে না !

রোশনারার লাল দুটো ঠোঁটের ওপর কয়েক মুহূর্তের জন্যে নিজের ঠোঁট দুটো চেপে ধরে তারপর অভিজিৎ বলল, তোমার স্মৃতির ওপর এই চুমু চাপিয়ে দিয়ে গেলাম, রোশন।

আবেশে চোখ বন্ধ করল রোশনারা।

আমি তাহলে আসি ?

এসো।